সে/ অভীক দত্ত

১।
।।উপমন্যু।।
প্রতিটা প্রেমে আমার পুনর্জন্ম হয়। প্রথমে গাধা ছিলাম। তারপর পিউ আমার সাথে প্রেম করল। কয়েকদিন গাধা পিটানোর চেষ্টা করল সবরকমভাবে।
পারল না। রেগে মেগে ছেড়ে দিল।
কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে পিউ যাবার পর দেখলাম আমি গাধা থেকে খানিকটা ঘোড়া হয়েছি। এটা কিভাবে সম্ভব হয়েছিল জানি না। হয়ত পার্কের কোণে টোনে মাঝে মাঝে চুম্মা চাটির ফল। আমি খেতাম না। ভয় লাগত। কেউ যদি দেখে ফেলে।
এসব ব্যাপারে পিউ অবশ্য খুব সাহসী। মেগান ফক্সের মত। ও হ্যাঁ, মেগান ফক্সকেও ওই চিনিয়েছিল আমায়। টানটান ফিগার। দেখার পরে প্রতি রাতে পিউর জায়গায় ওই স্বপ্নে আসত।
অবশ্য স্বপ্নে এসেই বা কি লাভ হত। সেখানেও তো কিছুই করতে পারতাম না আমি। পিউ যখন ঠোঁট ডোবাত আমার ঠোঁটে, আমি সতর্ক চোখে চারদিকে তাকাতাম। দেখতাম বাবার কোন মাসতুতো ভাই ঘোরাফেরা করছে না তো?
চুমুতে ওই জন্য সাড় থাকত না। আর সার না থাকার জন্য চুমুর পরবর্তী জমি উর্বর হত না। আর উর্বর জমিতে ওই জন্য কোন ফসল হল না। পিউ খুব খিস্তি টিস্তি করে আমাকে ছেড়ে চলে গেল।
চলে যাবার পর আমি দেখলাম আমার দুটো সুবিধা হল
১) আমার অনেক সময় বাঁচছে।
২) আমার অনেক টাকা বাঁচছে।
দুটোই আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল। আমার বাপের প্রচুর টাকা ছিল, আছে, আমি তখন কলেজে পড়তাম, হাত খরচাও খারাপ পেতাম না, কিন্তু আমাকে টাকার পুরো হিসেব দিতে হত বাড়িতে। পিউর সাথে প্রেম করতে গিয়ে আমার কলেজের নোটের জেরক্সের বিলে ম্যানেজ করতে হত, বাইকের তেলের পরিমাণ বাড়িয়ে দেখাতে হত, রেফারেন্স বইয়ের লিস্টটাকেও বাড়াতে হয়েছিল ওই দু মাস।
তবে সময় বাঁচাটা আসলে আমার সুবিধা না অসুবিধা বুঝতে পারি নি। কোন কাজ ছিল না। সারাদিন অর্কুটে বসতাম। এর প্রোফাইলে উঁকি, ওটায় উঁকি, এসব করতে করতে পিউর সময়টা ধীরে ধীরে খেয়ে ফেলল অর্কুট।
আর এই অর্কুট থেকেই দেবোপমার সাথে আমার পরিচয়। আমার বন্ধু নিশান আমাকে পই পই করে বলে দিয়েছিল "ওরে কিছুতেই প্রোফাইল ফটোতে হিরোইন, কিংবা কিউট কিউট ফটো দেখে ভুলবি না। সব ব্রণ ভর্তি গাল আসলে"।
আমিও যেমন। পোস্ট পিউ সেশনে খা খা মরু হ্রদয় তখন আমার মন মরূদ্যান খুঁজে বেড়াচ্ছে। দিলাম ভিড়িয়ে দেবোপমার ঘাটে। অর্কুট থেকে ইয়াহু মেসেঞ্জার, সেখান থেকে ব্যাপক সেন্টু খাইয়ে ফোন নাম্বার জোগাড়, তারপর কী যে হল, শুরু করলাম দেখা করার জন্য ঘ্যানঘ্যানানি।
মেয়েটা কিছুতেই দেখা করবে না। আমিও নাছোড়বান্দা। দেখা করার জন্য দরবার করতে করতে মোবাইলে, নেটে, জুতোর সোলের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি করে দিলাম। অবশেষে একদিন শিকে ছিড়ল।
সেদিন প্রচুর চ্যাটিয়ে, প্রতি চ্যাটের মাঝে কুড়ি পঁচিশ মিনিট অন্তর একবার করে অনুনয় করে চলেছি। রাত বারোটা নাগাদ বাই টাই, সুইট ড্রিমস আরও কিসব কিসব

বলে কম্পিউটার অফ করে ঘুমিয়ে পড়েছি। রাত দুটো নাগাদ মোবাইলটা দুবার বেজে বন্ধ হয়ে গেল। ও যতই জানুক আমি ঘুমিয়েছি, কিছুতেই ফুল রিং করবে না। পাছে ফোনটা ধরে ফেলি। খুব সেন্সিটিভ কিনা। আমার মেল ইগো হার্ট হয় যদি!
ঘুম চোখে কল ব্যাক করতে শুনি ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলা শুরু করেছে, ও নাকি খুব বাজে দেখতে, ওর লজ্জা করবে এভাবে আমার সামনে আসতে।
আমি হাই টাই তুলে বললাম, অত চাপের কি আছে। দেখাটাই কি সব নাকি। বললাম মানে এটা সারাংশ। ওকে বোঝাতে গিয়ে আমাকে ভাবসম্প্রসারণটা বলতে হয়েছিল। এই সব সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্তহীনতায় রাত কেটে গেল। এবং ঠিক হল পরের দিন আমরা দেখা করছি।
যুদ্ধ জয়ের আনন্দ নিয়ে ভোর পাঁচটায় আমি ঘুমোতে গেলাম।

দেবোপমা পরে বলেছিল ওই পাঁচটায় ঘুমিয়েও নাকি ওর ঘুম হয় নি, আমিও ওকে বলেছিলাম আমারও হয় নি, কিন্তু আমি আদ্যন্ত ঢপ মেরেছিলাম। আসলে ওকে বোঝাতে বোঝাতেও আমি ঘুমিয়ে পড়ছিলাম। পুরো কনভারসেশনটাই হয়েছিল আমার ঘুম আর জাগরণের মাঝখানে। যত জ্বলন্ত প্রেমই হোক, আমার ঘুম আসবেই, এবং আমার এক বিরল গুণ যে আমি ঘুমন্ত অবস্থাতেই কথা বলতে পারি।
সে রাতেই আমি ভেতর থেকে বুঝতে পেরেছিলাম পিউ কান্ডের পর আমি গাধা থেকে ঘোড়া হয়েছি। ঘোড়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোতে পারে আর আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বলতে পারি।
যাই হোক, গাধা ঘোড়ার চক্কর থেকে বেরিয়ে বলি,পরেরদিন আমার ঘুম ভাঙল দুপুর বারোটায়। আমার ঘুম কেউ ভাঙিয়ে দেয় না, আমার বাবা সকালে উঠে অফিসে চলে যায়, মাকে ঘুম থেকে উঠেই একগাদা ছাত্র ছাত্রীকে গান শেখাতে বসতে হয়, আর টাকা পয়সা বাদ দিলে আমি বাড়িতে বেশ ভালই স্বাধীনতা ভোগ করি।
দাঁত মাজার পর মোবাইল ঘেঁটে দেখি দেবোপমার তিনটে মিসড কল। বুঝে গেলাম আবার আমাকে ওকে বোঝানোর ক্লান্তিকর অধ্যায়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, তাই রিস্ক নিলাম না। আগে ব্রেকফাস্টটা করে নিলাম। নইলে খাওয়াও জুটবে না।
একটা নাগাদ ফোন করলাম আবার, ধরতেই বলল সল্টলেক সিটি সেন্টারে বিকেল পাঁচটার সময় ও আসছে। আমি নিশ্চিন্ত হলাম, যাক, খানিকটা টক টাইম বাঁচল তাহলে।
নিশান প্রেমের ক্ষেত্রে আমার টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসর।ওকে ফোন করে ডিটেলস বলতে আমার কথা শুনে প্রথমেই মুখটা ভেটকে বলল “কিছু করার নেই ভাই, কাটিয়ে দে, নিশ্চয়ই ভুঁড়ি আছে কিংবা ব্রণ। আবে প্রোফাইল পিক না থাকলে কোনদিন সেটা ঠিক ঠাক হয় না। তোকে এত করে বললাম তাও ফেঁসে গেলি”?
আমি আমতা আমতা করে বললাম “ সে তো জানি, কিন্তু আই থিঙ্ক আমাদের ওয়েভলেন্থ ম্যাচ করে। অ্যাটলিস্ট অরকুটে তো করে”।
নিশান শুনে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল “ব্যাস, তাহলে তো হয়েই গেল, ওয়েভলেন্থ ম্যাচ করে যখন তখন এবার সাউন্ড ওয়েভ তারপর লাইট ওয়েভ ম্যাচ করে মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াও। শালা, ইয়ে”।
আমি ওকে থামানোর চেষ্টা করলাম “আরে তুই চাপ নিস না, তেমন হলে কাটিয়ে দেওয়া যাবে”।
নিশান খানিকটা ঘোঁত ঘোঁত করে ফোনটা রাখল।
#

বাবা বলে মাথায় জেল দিলে নাকি চুলের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটতে বেশি সময় লাগে না। বাবার যে মাথা জোড়া ইডেন গার্ডেনস সেটা নাকি কলেজ লাইফে ওই ব্রিল ক্রিম ইত্যাদি দেওয়ারই সাইড এফেক্ট। পিউর সাথে দেখা করার সময় আমি ব্রিল ক্রিম দিতাম। তবে খুব সাবধানে।
পিউর প্রচুর গন্ধ বাতিক ছিল। ঘামের গন্ধে ওর বমি আসে, একটু লাউড পারফিউমে মাথা ধরে, আমি শুনে একবার গম্ভীর মুখে বলেছিলাম "হ্যাঁ রে, তুই বাথরুম টাথরুম যাস তো? ওখানে তো..."
কথা শেষ করতে দেয় নি।
দেবোপমা কী টাইপ কথা বলে বুঝি নি অতটা। তবে দেখা হবার পরে আমি সত্যিই চমকালাম।
এবং মনে হচ্ছিল হাতের কাছে পেলে নিশানকে গুলি করে মারি। আমার অবচেতন যখন ভেবে নিয়েছিল দেবোপমা দেখতে খুব একটা ভাল হবে না সুতরাং ক্যাসুয়াল ড্রেসেই যাওয়া যাবে, আর সেই মতোই আমি গেছিলাম,ঠিক পাঁচটায় ওই খেলনা ট্রামের সামনেটায় এসে যেন মনে হয় আমি একটা ধাক্কা মত খেলাম। মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল নিজে থেকেই "মার গাড়িয়েছে"।
মেয়েটা দুর্ধর্ষ দেখতে। এক্কেবারে চেঙ্গিস খাঁ টাইপ মেয়ে। ডানাকাটা পরী টরি বলতে যা বোঝায় তাই।আর কি একটা ড্রেস পড়েছে কে জানে, ওখানকার অর্ধেক কাপল যারা বসেছিল, প্রত্যেকটা মেয়ের মনে আগুন জ্বলছিল যেন দেবোপমাকে দেখে কারণ বেশিরভাগ ছেলেই টেরিয়ে টেরিয়ে দেবোপমাকেই দেখছিল।
আমার হা-টা বন্ধ হচ্ছিল না। ওকেই বলে বসলাম "তুমি যে বলেছিলে তুমি বাজে দেখতে?" আর বলতে বলতে আমার সেই জিনিসটা হল। আমার মনে হচ্ছিল কথা বললেই আমার মুখ থেকে থুতু বেরিয়ে যাচ্ছে, আমার মনে হয় প্যান্টের চেনটা খোলা আছে, দাঁতগুলি হলুদ লাগছে, মানে আমি ফুল ফুল চাপে পড়ে গেলাম। এতটা চাপে আমি পিউর সাথে প্রেমের সময় পড়িনি।
দেবোপমা আমাকে দেখে হেসে বলল "আমি ভাল দেখতে?"
আমি ক্যাবলার মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

২।
।।পিঙ্গল।।
১ দিয়ে আমরা নাম্বারিং শুরু করি। কিন্তু ১ দিয়ে কোন কিছু শুরু হবার পরে দেখা যায় ০ তেও কিছু ছিল। যে শূন্যের কোন ভ্যালু নেই। কিন্তু আসলে অনেকটাই আছে। ভ্যালু ঠিক করার আমরা কে? ক্লাস সেভেনে বিপুল স্যার বলতেন। মাথার উপর হরলিক্সের কাঁচের মত চশমাটা তুলে দিয়ে। ওই একটা শূন্য অনেক কিছু ঠিক করে দেয়। শূন্য একা থাকলে কেউ দেখতে পায় না। তার সাথে কেউ জুড়ে গেলেই তার ভ্যালু অন্যরকম হয়ে যায়। আবার অনেক সময় আগে জোড়া বা পরে জোড়ার উপরও অনেক কিছু নির্ভর করে। যেমন কোন সংখ্যার আগে যদি শূন্য বসে তবে সেই সংখ্যার ভ্যালু চেঞ্জ হয় না। ১ এর আগে ০ বসলে ০১ হয়। ১ আর ০১ একই। কিন্তু ১ এর পরে বসলে শূন্য বাদশা। ১০, ১০০, আর চলেই যাচ্ছে, শেষ নেই। কিন্তু একটা দশমিক বসিয়ে নাও। তখন আবার পরের শূন্যর কোন ভ্যালু নেই। .১০ ও যা, .১ ও তাই, কিন্তু .১ যা .০১ তাই না।
কী সব ভুলভাল বকছি শুরুতেই। আসলে ওকে নিয়ে বলতে গেলে আমার এরকমই অবস্থা হয়। ঘটনাটা হল ও আমাকে শূন্য দিয়ে গেছে, কিংবা শূন্য করে গেছে। অথচ

কিছুই ছিল না তার সাথে। না প্রেম, না অন্য কিছু। ক্লাস সেভেনে এন সি স্যারের কোচিং থেকে একসাথে পড়ি। একটা লেডিবার্ড সাইকেল নিয়ে আসত। মাঝে মাঝে আমার পাশে বসত। ওর গা থেকে একটা আলগা গন্ধ আসত। গন্ধটা আমার ভাল লাগত ঠিকই, কিন্তু স্পেশাল কিছু ছিল না। মাঝে মাঝে ওর সাথে কথাও হত। ক্লাস নাইনে আমি ওদের সেকশনে এন্ট্রি পেলাম। তখনও ওর সাথে আমার বিরাট কিছু বন্ধুত্ব হয় নি। তবে আমাদের গ্রুপের মধ্যে ওও ছিল।
ঘটনাটা ঘটেছিল এক শুক্রবার দুপুরে।মাধ্যমিকের প্রি টেস্ট পরীক্ষার তিন দিন আগে। দিনটাও আমার পরিষ্কার মনে আছে। ডি এসের ব্যাচে পড়া, স্পেশাল সাজেশন দেবার কথা। আমি বাড়ি থেকে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে বৃষ্টির খপ্পরে পড়ে গেলাম। সে কী বৃষ্টি। চারদিক সাদা হয়ে গেছে। দুপুর বলে দোকানপাট সব বন্ধ। সন্তোষপুরের যে বাড়িটায় আমরা পড়তে যেতাম, সেটা তখনও দু তিন কিলোমিটার দূরে হবে। উপায় না দেখে একটা বন্ধ দোকানের টিনের শেডের তলায় দাঁড়িয়েছি। যা ভিজেছিলাম তখন আমার আর সম্ভব ছিল না কোচিংয়ে যাবার। তখন মোবাইলও ছিল না যে স্যারকে ফোন করে জানাব। উপায় না দেখে অসহায়ের মত বৃষ্টি শেষ হবার জন্য দাঁড়িয়েছি।
হঠাৎ দেখি ও যাচ্ছে।ওর ছাতা ছিল কিন্তু ছাতায় কিছু হচ্ছে না। ভিজে কাই হয়ে গেছে।তবু মোহগ্রস্থের মত সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। আমি জোরে ডাকলাম ওকে। ও আমার দিকে তাকিয়ে চিনতে চেষ্টা করল। তারপর চিনতে পারল। সাইকেলটা রেখে শেডের তলায় এল। আমার পাশে দাঁড়াল। ও আমার মতোই পুরো ভিজে গেছিল। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল কোন কারণে ও প্রচন্ড শকড। ঘোরের মধ্যে আছে।
আমি বুঝতে না পেরে ক্যাবলার মত বললাম “কি বৃষ্টি বল? এত ভিজছি, আজ আর পড়তে যাওয়া হল না”।
ও হঠাৎ কেঁদে ফেলল। ওখানেই। আমি রীতিমত অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। কি করব বুঝতে পারছিলাম না। ভাগ্যিস চারপাশে কেউ ছিল না সেদিন। বৃষ্টিতে সব বন্ধ। রাস্তাঘাটে মাঝে মাঝে দুয়েকটা গাড়ি যাচ্ছিল। আমি বললাম “কিরে, কাঁদছিস কেন? কি হয়েছে বলবি তো?”
ও কিছুক্ষণ কেঁদে টেঁদে মুখ শক্ত করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি আর কোন কথাও বললাম না। বৃষ্টি থামতে চুপচাপ সাইকেল নিয়ে ও চলে গেল। আমিও বাড়ি চলে এলাম। ওই দীর্ঘ আধঘণ্টা ও আমার সাথে একটাও কথা বলে নি। চুপচাপ শূন্য দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল।
আমি বাড়ি এলাম। কিন্তু মনটা ভীষণ খচখচ করতে লাগল। আমি ওকে ফোন না করে ওর বেস্ট ফ্রেন্ড তনিমাকে ফোন করলাম, যেটা ঘটেছে সেটা বললাম, তনিমা পুরোটা শুনে যেটা বলল সেটা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।
কোথায় যেন শুনেছিলাম, বয়ঃসন্ধির পরে আমাদের বয়সী মেয়েরা মানসিক ভাবে আমাদের থেকে কম করে তিন থেকে চারবছর বড় হয়। সেদিন কথাটা বুঝতে পারলাম হঠাৎ করে।
আমি কিংবা আমাদের ব্যাচের ছেলেরা যখন খেলাধুলো, মারপিট, মাধ্যমিক ইত্যাদি নিয়ে এত ব্যস্ত, তখন ও একটা প্রেমে জড়িয়ে পড়েছিল। ওর মিউজিক টিচারের। প্রায় তিন মাস ধরে সেই প্রেম চলে, এবং ওই বৃষ্টির দিনই ও জানতে পারে ওর মিউজিক টিচার বিবাহিত ছিল। গোটাটাই একটা শকের মত আসে ওর কাছে। সামনে মাধ্যমিক, এখন কী করে এসব সামলাবে ওই জানে
কিন্তু আমার এত ভাবার সময় ছিল না, উপপাদ্য, এক্সট্রা, পানিপথের যুদ্ধ, অ্যামিবার

চলন, কেঁচোর গমন ভূমিকম্পের গতি প্রকৃতি মিক্স হয়ে মাথাটা এমন ঘুরপাক খাচ্ছিল যে আর কোন কথা মাথায় আসেনি। শুধু পরীক্ষার দিন ওর মুখটা দেখে ধাক্কা মত লেগেছিল। হঠাৎ মনে হয়েছিল, আমরা এসব নিয়ে তালগোল খাচ্ছি আর ওকে এগুলির সাথে ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিসের মত ওই লোকটাও ওর প্রোগ্রামে ভাইরাসের মত ঢুকে পড়েছে, যেটা ওকে খুবলে খুবলে শেষ করে দিচ্ছে।
পরীক্ষার প্রতিটা দিন ও যখন হলে ঢুকত ওকে মরা মানুষের মত লাগত। চোখে সাড় নেই, কারও দিকে তাকায় না। নিজের মত সিটে গিয়ে বসত, পরীক্ষা দিয়ে একমিনিটও দাঁড়াত না, বরং কারও প্রশ্ন শোনার ভয়েই হয়ত পরীক্ষা শেষের পাঁচ মিনিট আগে খাতা জমা করে চলে যেত। তনিমার সাথে খুব বেশি কথা বলতে ওকে দেখি নি, বরং ওই সময়টা তনিমার সাথে আমার স্বাভাবিক একটা বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল, ওর ব্যাপারে অনেক কথা হত আমাদের মধ্যে। তনিমা যে ওর কষ্ট দেখে ছটফট করছে সেটা বুঝতাম, কিন্তু ও এইসব ব্যাপারে একদম চুপ করে গেছিল। কারও সাথেই কোন কথা বলত না।
পরীক্ষার শেষ হবার সাত দিন পরে স্কুল শুরু হল। ও সেকেন্ড বেঞ্চে বসত চিরকাল। কিন্তু পরীক্ষার পর লাস্ট বেঞ্চে গিয়ে বসত। ক্লাসের যারা যারা ওর কেসটা জানত তা সবাই ওর এই পরিবর্তনে অবাক হয়েছিল। আমি আর তনিমা ওর পাশে গিয়ে বসলাম। ও চুপচাপ দেখল সেটা কিন্তু কোন কথা বলল না।

প্রি টেস্টের রেজাল্ট বেরল। ওর রেজাল্ট ভীষণ খারাপ হল। কিন্তু ওর মধ্যে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম না আমরা। কিন্তু ওর পাশে বসাটা ছাড়ি নি। তনিমা প্রায় রোজই চেষ্টা করত ওকে স্বাভাবিক করার, কিন্তু করা যেত না।
একদিন তনিমা আসে নি। সেদিনের এক সপ্তাহ পরে স্কুল বন্ধ হবার কথা। আমি যথারীতি ওর পাশে গিয়ে বসেছি। ফার্স্ট ক্লাসটা হয়ে গেছে। আর জি ম্যাম ক্লাস থেকে বেরিয়েছেন। ও হঠাৎ আমাকে বলল “তোর চেনাজানা এমন কেউ আছে যে টাকা নিয়ে লোককে মারধর করে আসতে পারে?”
আমি চমকে ওর দিকে তাকালাম। এই কথাটা আমার কাছে চূড়ান্ত অপ্রত্যাশিত ছিল। আমি কোনদিন ভাবতে পারি নি ও এইরকম একটা কথা আমাকে বলতে পারে।

৩।
উপমন্যু
।।ইতিহাস মোড অফ।।
।।বর্তমান মোড অন।।
আমার মামাতো দাদা পিঙ্গল আমার খুব কাছের। ওকে নিয়ে আমাদের সবাই খুব চিন্তিত। আমার থেকে ও মাত্র তিন বছরের বড়। আর আমাদের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব। আমার প্রেম-পিরীতির ইতিহাস তো বলবই তার আগে ওর একটা ঘটনা শেয়ার করে রাখি। কারণ আমার মহাভারত আবার শুরু হলে বাকি ইলিয়াড-ওডিসিগুলি বহুত রেগে যেতে পারে।
পিঙ্গল একটা নামী এম এন সিতে চাকরি করে। মাঝে মাঝেই স্যুট টাই হাঁকিয়ে দেশ বিদেশ ঘুরে আসে। আর কিছুতেই বিয়ে করতে চায় না। ওর কেস কী, কোন প্রেম আছে নাকি, তা আমিও বের করতে পারি নি। ছোটবেলা থেকেই ব্যাটা এরকম। পেটে

বোম মারলেও কথা বের করবে না। আমাকে একটা বিরাট কেসে বাঁচিয়েছিল একবার। কিন্তু সেটাও পরে বলছি।
তা মামী আর দিদা খুব সেন্টু ফেন্টু খাইয়ে পিঙ্গলকে রাজি করাল এবার বিয়ের ব্যাপারে। কেউ কোন কথাই শুনতে চাইল না। পিঙ্গল না না করতে করতে শেষে হাল ছেড়ে দিল। বলে ফেলল ঠিক আছে তোমরা যা করার কর।
নিশান পিঙ্গলকে খুব হিংসা করে। প্রায়ই আমাকে বলে "তোর দাদার মত কেত পেলে শালা শারাপোভাকেও তুলে নিতাম। কি করে মালটা? জীবনে ওর এত ফ্রাস্ট্রু কেন? ধরে কেলাতে পারিস না?"
শুনে হাসলেও মাঝে মাঝে মনে হয় ব্যাটা ঠিকই বলে। এত হ্যান্ডু একটা ছেলে যে কি লেভেলে উদাসীন থাকতে পারে সেটা ওকে না দেখলে কে বুঝত! আমাদের ক্লাসের অলিভিয়ার ওর ওপর চরম চাপ ছিল। আমাকে জ্বালিয়ে খেত, প্লিজ একটু পিঙ্গলের সাথে ইন্ট্রো করিয়ে দে না।
তা করেও দিয়েছিলাম, আগে থেকে ফোনে বলে রেখেছিলাম, আমি আর পিঙ্গল সেদিন হাইল্যান্ড পার্ক গেছিলাম। ফুড কোর্টে ঢুকতেই অলিভিয়া এগিয়ে এল, "হাই, কিরে তুই এখানে?"ইত্যাদি দিয়ে শুরু করল। কিন্তু ওর অ্যাক্টিংটা এত বেশি হয়ে গেল, পিঙ্গল ধরে ফেলল কেসটা। আমাকে পরে খুব ঝেড়েছিল। এসব ঝাটু ব্যাপারে যেন ওকে না জড়াই ইত্যাদি বলে। আমি সেটা ট্রান্সফার করেছিলাম অলিভিয়াকে। শুনে খুব খচে ফচে বলল "তোর দাদার অত অ্যাটি কিসের রে? ও কি টম ক্রুজ নাকি?" আমি আর উত্তর দিই নি, আমার আবার খুব নরম মন কিনা, মেয়েদের কষ্ট দিতে আমার খুব দুঃখ হয়।
যাক গে, আমি আবার বেলাইনে চলে যাচ্ছি। যেটা বলছিলাম, পিঙ্গলের জন্য মেয়ে দেখা হল। জীবনানন্দের বনলতা সেন টাইপ মেয়ে।হাটু পর্যন্ত চুল। ভিন্টেজ টাইপ আর কি। নাম তনুশ্রী। পিঙ্গল প্রথমে না, না করলেও দেখার পরে যখন কিছু বলল না তখন বুঝলাম ওরও পছন্দ হয়েছে। কলকাতারই মেয়ে। ইতিহাসে অনার্স করছে। ওই বাড়ি থেকে দেখতে এল। এই বাড়ি থেকেও যাওয়া হল। নাম্বার দেওয়া নেওয়াও হল। মাঝে মাঝে দেখি আমাদের সাথে কথা বলতে বলতে পিঙ্গল হোয়াটস অ্যাপে তার সাথে কথা বলছে। বেশ মাখো মাখো ব্যাপার আর কি, আমরাও বুঝে গেলাম, যাক, এবার পিঙ্গল কী যেন বলে ওই বাংলা সিনেমা টাইপ সাত পাকে বাধা কিংবা পাঁকে পড়তে চলেছে। মামা মামী তাদের ভাবী পুত্রবধূর সাথে একদিন শপিং করে এল। মামী তো তনুশ্রী তনুশ্রী করে অজ্ঞান। মানে যাকে একদম টোটাল মাখো মাখো ব্যাপার বলে।
কিন্তু কপাল যাকে বলে।এক রবিবার। মামা মামীরা পুজো দিতে গেছে দক্ষিণেশ্বরে। পিঙ্গল আমাদের বাড়ি এসছে। নিশান এসছে। আমরা মেসি-নেইমার নিয়ে চরম ঝগড়া আরম্ভ করেছি, নিশান আবার বিরাট মেসি ভক্ত, একই সাথে সচিনেরও ভক্ত, হাত পা নাড়িয়ে বলা শুরু করেছে সচিন আর মেসি নাকি স্বর্গে একই কলোনিতে থাকে, ঠিক সেই সময় দেখি পিঙ্গলের একটা ফোন এল। পিঙ্গল ফোনটা ধরেছে কিন্তু তখনও নিশান বকবক করে যাচ্ছিল। পিঙ্গল নিশানকে একটা বিকট ধমক দিল। ধমক খেয়ে নিশান ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপ করে গেল।
কিছুক্ষণ কথা বলল পিঙ্গল। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম আবার কিছু একটা বাওয়াল হয়েছে। ফোনটা রাখার পর বসল। আমি বললাম "কি হল?"
পিঙ্গল ওই শকড অবস্থাতেই বলল "তনুশ্রীর নাম্বার থেকে একটা ছেলে ফোন করেছে। বলল ওদের নাকি অনেক দিনের রিলেশনশিপ, এই নিয়ে আমরা যেন আর

না এগোই”।
আমি আর নিশান চোখ চাওয়া চাওয়ি করলাম। নাও ঠ্যালা। যাও বা একটা কেস মিটছিল, আবার বাওয়াল।
মা কে ডাকলাম। সব বললাম। পিঙ্গল আর কিছু বলল না। মা অবাক হয়ে বলল “এ আবার কি রে? অদ্ভুত ব্যাপার তো? দাঁড়া আমি একবার তনুশ্রীকে ফোন করি”।
পিঙ্গল গোঁজ হয়ে থাকল। কোন কথা বলল না।
আমার ফোন থেকে মা তনুশ্রীকে ফোন করল। বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে ফোনটা রেখে অবাক গলায় বলল “ও বলছে ওর বন্ধুরা নাকি এসছিল ওদের বাড়িতে। পিঙ্গলকে নিয়ে ইয়ার্কি মারছে। আমি আর কিছু বললাম না, কিন্তু এ কেমন ইয়ার্কি রে বাবা?”
পিঙ্গল মার দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসল, “না পিসি, ওটা ইয়ার্কির গলা হতে পারে না। এরকম গলা আমি খুব ভালভাবে চিনি”।

বাড়িতে মোটামুটি হুল স্থুল পড়ে গেল মামা মামী আসার পরে। ঠিক হল, পিঙ্গলের বাবা মা আর আমার বাবা মা আজকেই তনুশ্রীর বাড়ি যাবে। আমি যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে মা এমনভাবে তাকাল, আগেকার দিন হলে ভস্ম হয়ে যেতাম।
ওরা আবার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল। মামা মামী বেশ চাপে পড়ে গেছে বোঝাই যাচ্ছে। আমরাও সবাই কম বেশি চাপে পড়েছি। ব্যাটাকে অনেক কষ্ট করে বিয়ের জন্য রাজি করানো হয়েছিল। এখন যদি আবার এই বিয়েটাও ভাঙে তাহলে আবার সব কিছু রি সেট করে রি স্টার্ট করতে যে বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হবে তা বলাই বাহুল্য।
পিঙ্গল এই সময়টা কোন কথা বলছিল না। মোবাইলটা খুট খুট করত অন্য সময়, সেটাও বন্ধ। আমি ইচ্ছা করেই ওর ফোকাসটা ঘোরাতে নিশানের সাথে ভাট তর্ক জুড়ে দিলাম “কিরে, ডি মারিয়া তো ফুটে গেল, এবার রবেন তো তোদের ছারখার করে দেবে”।
নিশান অনেকক্ষণ চাপে ছিল, সেই দুপুর থেকে ও এই সব দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছিল। বাড়ি যাব যাব দুয়েকবার বলেছিল কিন্তু ওকে রাত্রে খেতে বলা আছে, চলে যেতে বললেও অভদ্রতা করা হয় বলে আমি আটকেছি। এখন এই বিতিকিচ্ছিরি সিচুয়েশন থেকে বের হতে আমার ওরই হেল্প দরকার মনে হচ্ছিল।
নিশান আমার কথার উত্তর দিতে গিয়ে আরও কেলো করে ফেলল, বলল “সবই তো বুঝলাম কিন্তু পিঙ্গলদার কেসটা তো সেমসাইড হয়ে গেল মারসেলোর মত”।
আমার মুখে খিস্তি চলে এসছিল হঠাৎ দেখি পিঙ্গল নিশানের কথা শুনে হো হো করে হাসা শুরু করল। আমরা চাপ খেয়ে চাওয়া চাউয়ি করলাম। এ কি পাগল টাগল হয়ে গেল নাকি?
#
রাত সাড়ে আটটা।
পিঙ্গল এদিকে পায়চারি শুরু করেছে আমাদের বাড়ির বারান্দায়। তনুশ্রী বার পাঁচেক পর পর ফোন করে থাকবে ওর মোবাইলে, ও ফোনটা তুলল না। আমি ঘর থেকেই চেঁচিয়ে বললাম “কিরে, কে ফোন করছে”?
পিঙ্গল ঘরে ঢুকে মোবাইলটা টেবিলের উপর রেখে তাচ্ছিল্যের সাথে বলল “চেঁচাস না, তনুশ্রী”।
আমি বললাম “তাহলে ধর, দেখ সমস্যাটা কি? ক্ষমা টমা চাইছে নাকি”।
পিঙ্গল ঠাণ্ডা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল “দোষ করেনি তো কোন, ক্ষমার প্রশ্ন

আসছে কোত্থেকে?"
নিশান বলল "দোষ করেনি যখন ফোনটা ধরতে তোমার আপত্তি কোথায়?"
পিঙ্গল হাসল "আই হেট এক্সপ্ল্যানেশনস"।
নিশান মুখটা বাঁকাল পিঙ্গলকে আড়াল করে, যার মানে হয় 'দেখ তোর দাদার কেত আবার শুরু হয়ে গেল"।
আমি পিঙ্গলকে বললাম "আমি কি একবার তনুশ্রীর সাথে কথা বলব? ও বাড়িতে ঠিক কি হচ্ছে জানা যেত"।
নিশানের মুখ দেখে মনে হল আমার কথাটা ওর বেশ পছন্দ হয়েছে। পিঙ্গল কাঁধ ঝাঁকাল, "তোর যা ইচ্ছা"।
আমি দেরী করলাম না, কৌতূহল হচ্ছিল প্রচুর। পিঙ্গলের ফোন থেকেই মিসড কল নাম্বারটায় কল ব্যাক করলাম।
একটা রিং হতে না হতেই তনুশ্রী ধরল "পিঙ্গল আমি এক্সট্রিমলি সরি"।
আমি বাঁধা দিলাম, বললাম "না না, আমি পিঙ্গল না, আমি ওর মামাতো ভাই, উপমন্যু"।
তনুশ্রী দু সেকেন্ড থমকালো, তারপর বলল "ও কি খুব রাগ করেছে?"
আমি আড়চোখে একবার পিঙ্গলের দিকে তাকালাম, খবরের কাগজটা খুলে নিবিষ্ট মনে বিশ্বকাপের খবর পড়ছে, যেন কী হচ্ছে না হচ্ছে তা নিয়ে ওর কোন আগ্রহই নেই।
আমি গলা খাকড়িয়ে বললাম "না না, রাগ করে নি, তবে আমরা একটু চিন্তায় পড়েছি এই আর কি। কে ছেলেটা? তোমার বি এফ?"
আমার সরাসরি প্রশ্নে ওপাশটা মনে হয় একটু চাপ খেল। আবার কয়েক সেকেন্ডের পজ, তারপর বলল "এটা একটু পার্সোনাল ব্যাপার। পিঙ্গলকেই বললে ভাল হত"।
আমার মধ্যে বরাবরই একটু জ্যাঠামো ভাবটা বেশি, বলে বসলাম "না সেটা বলতে ঠিক আছে, কিন্তু যদি তোমার বি এফ হয় ছেলেটা, বা বি এফ থেকে থাকে তোমার, তাহলে পিঙ্গলের সাথে কথা বলার দরকার কী আছে,তোমরা বিয়েটা ভেঙে দিলেই পার। এ তো আর সিনেমা সিরিয়াল না, বিয়ে টিয়ে ঠিক হয়ে গেছে আর এরকম উড়ো ফোন, তাও অন্য কোন ফোন থেকে হলে কথা ছিল, একেবারে তোমার ফোন থেকেই আসছে, এগুলি তো একেবারে আনএক্সপেকটেড তাই না?"
পিঙ্গল একটা পেপারওয়েট তুলে আমার দিকে তাক করেছে, মানে খচেছে ব্যাটা আমার কথা শুনে, আমি ভালমানুষের মত মুখ করে রইলাম।
তনুশ্রী ধরা গলায় বলল "ব্যাপারটা সেরকম না, আমার একটা অ্যাফেয়ার ছিল ঠিকই,ছেলেটা আমাদের পাশের বাড়িতেই থাকে। কিন্তু সেটা কেটে গেছিল অলমোস্ট এক বছর আগে। আজ দুপুরে ও আমাদের বাড়িতে এসছিল কী একটা অজুহাতে, আমি তখন বসার ঘরে টিভি দেখছি। ও কিভাবে যেন আমার ফোনটা জোগাড় করে পিঙ্গলকে ফোন করে, আমিও ঠিক জানি না। কিছু পরে তোমাদের বাড়ি থেকে যখন ফোন আসে তখন আমি পুরো আকাশ থেকে পড়ি, কোনমতে ইয়ার্কি বলে ব্যাপারটা কাটাই। কিন্তু এখন তোমাদের বাড়ির লোকেরা এসেছ, বিয়েটা যদি ভেঙে যায়..." ও কথাটা শেষ করতে পারল না।
নাও, দ্যাটস আ ব্রেকিং নিউজ। পিঙ্গলের হবু বউয়ের এক্স বয়ফ্রেন্ড বিলা করেছে। আমার অবশ্য তাও হিসাব মিলছিল না, কিছু একটা অন্য গল্প আছে, পরিষ্কারই বুঝতে পারছিলাম। রবিবারের দুপুরবেলা পাশের বাড়ির এক্স প্রেমিক ঘরভর্তি লোকের সাথে কন্যার ফোন নিয়ে সে ফোন থেকে ফোন করে কন্যার হবু বরের মোবাইলে ফোন করে হুমকি দিয়ে চলে গেল আর সেই সময় কন্যা কি গাঁজা

টানছিল?
পিঙ্গল আবার কাগজে মন দিয়েছে পেপারওয়েটে রেখে, আমি এবার একটু শক্ত গলাতেই বললাম জ্যাঠামশাই মোড়ে, "দেখ, এটা যেহেতু একটা রিলেশনের ব্যাপার, সো ইট ডিমান্ডস ট্রান্সপারেন্সি। আমার মতে পিঙ্গলের বাবা মার সামনে তুমি পুরো ব্যাপারটাই খুলে বল, আমাদের বাড়ির সবাই কিন্তু এই ব্যপারটা নিয়ে খুব আপসেট"।
পিঙ্গল হঠাৎ উঠে আমার হাত থেকে ফোনটা কেড়ে নিয়ে কেটে দিল ফোনটা। নিশান এতক্ষণ খুব চাপ নিয়ে আমার কথা শুনছিল। হঠাৎ এই কমার্শিয়াল ব্রেকে ওর মুখ থেকে আপনা আপনি বেরিয়ে এল "যাহ্ শালা"।
#
রাত পৌনে দশটা নাগাদ ভগ্ন সৈনিকের মত সব এল। আমার আর নিশানের খাওয়া তখন শেষের দিকে। পিঙ্গল খেতে বসে নি, আমরাও আর জোরাজুরি করি নি। ওর যা মানসিক অবস্থা, তাতে বেশি টানাহ্যাঁচড়া করে লাভ নেই। খিদে পেলে আবার আমার মাথার ঠিক থাকে না। যখন তখন যাকে তাকে কামড়ে দিতে পারি। তাছাড়া আমি না বসলে নিশানের খাওয়াও হবে না। খামোখা ওকে দেরী করিয়ে লাভ নেই। পিঙ্গল অবশ্য আমাদের সাথেই এসেছিল ডাইনিং রুমে। কিছুক্ষণ টেবিলে বসে আবার টিভি দেখতে পাশের ঘরে চলে গেছে।
নিশান ফিসফিস করে বলল "তোর এই দাদা মালটা বেশি অ্যাটি নিতে গিয়ে টাইটানিক হল বুঝলি?"
আমি মুরগীর ঠ্যাংটা কায়দা করতে করতে বললাম "তুই ভাট বকা বন্ধ করে চুপচাপ খা তো, পিঙ্গলের কেস অনেক জটিল কেস। আমার একটা হালকা ডাউট আসছে, কিন্তু সেটা বলব না এখনই"।
নিশান উত্তেজিত হয়ে খাওয়া টাওয়া ফেলে প্রায় আমার ঘাড়ের কাছে এসে পড়ল "কী সন্দেহ, মেয়েটা কী বলল একটু খোলসা করে বল তো গুরু"।
আমি মাথা নাড়লাম, "উহু মামা, এখনই না। ডাউট ক্লিয়ার না হলে কিচ্ছু বলে ফাউ বিলা করার রাস্তায় আমি নেই"।
নিশান আবার মুষড়ে বসে পড়ল। পাতে চাটনি পড়ল যখন তখনই মামা মামী, বাবা মা সব এল। আমি চাটনিটা কোন মতে খেয়েই বসার ঘরে দৌড়লাম, নিশান আটকাতে যাচ্ছিল বটে কিন্তু বললাম "তুই খা, অতিথি নারায়ণ বলে কতা! খেয়ে দেয়ে আয়"। ও মুখটা ব্যাজার করল।
আমি হিসাব করে দেখে নিয়েছি এরপর মিস্টি আছে, ও পরে খেলেই হবে, আগে খবরটা নিয়ে আমার হিসাব মিলাতে হবে।
ওরা চারজনই চুপচাপ বসে রয়েছে টিভির ঘরে, পিঙ্গল নিবিষ্ট মনে টিভি দেখে যাচ্ছে। আমি ঢুকেই জিজ্ঞেস করলাম "কী হল? কেসটা কিছু বোঝা গেল?"
মামা আসলে মনে হয় পিঙ্গলকে শোনাবার উদ্দেশ্যেই গলা খাকারি দিয়ে বলল "তনুশ্রীদের বাড়িতে এ নিয়ে অনেকক্ষণ কথা হল ওরা তো বলল এইসব বন্ধুদের মধ্যে হয়, তবে"...
-"তবে কি?" আমি আর উত্তেজনাটা চেপে রাখতে পারছিলাম না।
"ওই পাড়ায় আমার এক এক্স কলিগ থাকে, তার সাথে বেরনোর সময় হঠাৎ দেখা, আমাদের গাড়িটা যখন বেরচ্ছিল গলি থেকে তখনই আর কি। তা তিনি যা বললেন তাতে এই বিয়েটা আমি আর হবার কারণ দেখি না" মামা একবার আড়চোখে পিঙ্গলের দিকে তাকাল, পিঙ্গলের কোন নড়াচড়া নেই। কিছুক্ষণ থেমে মামা বলল "মেয়েটার পাশের বাড়ির এক ছেলে আছে। তার সাথে নাকি মেয়েটাকে প্রায়ই এপাড়া

ওপাড়া ঘুরতে দেখা যায়। এটা শোনার পরে...”
মামী কাঁদো কাঁদো গলায় বলল “কিন্তু ওদের বাড়ি গেলে কিন্তু এসব বোঝা যায় না, ওরা খুব আদর আপ্যায়ন করল। তনুশ্রীর মুখ দেখেও সেরকম কিছু বোঝা গেল না, ওরা বরং এই ঝামেলায় বেশ উদ্বিগ্ন”।
মা মাথা নাড়ল “না না বৌদি, আমার ঠিক সুবিধের লাগে নি কিছু একটা। তোমরা এটা নিয়ে এগোনর আগে ভাবো। আর যাই হোক, একটা বিয়ের ব্যাপার, সারাজীবন একসাথে থাকবে। তোকে কিছু বলেছে পরে মেয়েটা, বাবু”?
মা পিঙ্গলকে প্রশ্নটা করল। পিঙ্গল আমার দিকে দেখিয়ে দিল। সবাই অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল, আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললাম, “হ্যাঁ, বলেছে তো, ওর মোবাইলে ফোন করেছিল, আমি কথা বলেছি, ওই একই পাশের বাড়ির ছেলের গল্প”।
নিশান খেয়ে এই ঘরে এল, ওকে দেখে সবাই একটু সামলে নিল, মা বলল “কিরে খেয়েছিস তো ঠিক মত?”
নিশান মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। আমি ওকে বাইরে ছাড়তে এলাম।
নিশান বেরিয়ে এল তাড়াতাড়ি। বাইকটা বের করছিল, আমার মাথায় একটা প্ল্যান এল। আমি বললাম “একটা কাজ করতে হবে বুঝলি? একটা ছোটখাট গোয়েন্দাগিরি। একজনকে ফলো করার ব্যাপার। তুই পারবি?”
নিশান আমার কথাটা শুনে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল “আমি কি প্রাইভেট এজেন্সি খুলেছি নাকি বে? তাছাড়া ধরা পড়লে গণ ক্যালান খেলে কে বাঁচাবে আমাকে?আমি তো আর তাপস পাল নই যে পকেটে মাল নিয়ে... ” কিছুক্ষণ থমকে বলল “এই পিঙ্গলদার কেসটা নাকি?”
আমি আর কথা বাড়ালাম না, “ওকে তুই এখন যা, কাল আবার কথা বলব। আই নিড সাম হেল্প”।
“না না বল আগে, কেস কি? তুই হঠাৎ ফেলুদা হতে যাচ্ছিস, শিওর চাপের কেস। তখন থেকে এখানে বসে আমার ঝাঁট জ্বলেছে, কিছুই বুঝছি না তোরা কি করছিস না করছিস, এখন তো বল কিছু একটা”।
আমি পালালাম “কালকে কালকে, আমি যাব তোদের বাড়ি”।
“ধ্যাত, বল না প্লিজ”।
“বললাম তো কাল, তাছাড়া”, মুখটা গম্ভীর করলাম “এখন সিরিয়াস মিটিং চলছে, আমার থাকাটা জরুরি বুঝতেই পারছিস”।
নিশান রেগে মেগে বাইক নিয়ে বেরিয়ে গেল।

আমি তাড়াতাড়ি ঘরে এলাম, এখন গুরুত্বপূর্ণ মিটিং চলছে, মিস করা যাবে না। দেখি বাবা উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলছে, “দেখ, আমাদের সময় এরকম পাশের বাড়ি যাতায়াতটা কোন ব্যাপার ছিল না, ইন ফ্যাক্ট আমাদের সবারই পাড়ায় বন্ধু বান্ধব ছিল, আমরা ছেলে মেয়ে এভাবে এত কিছু দেখি নি।এর বাড়ি তার বাড়ি যাওয়াটাও জলভাত ছিল। কিন্তু এখন সময় পাল্টেছে, নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির যুগ। পাশের বাড়ির একটা ছেলে...”
আমি গম্ভীর গলায় বললাম “তাছাড়া তনুশ্রী তো স্বীকারই করে নিয়েছে ওর ওই ছেলেটার সাথে এককালে অ্যাফেয়ার ছিল”।
সবার চক্ষু ছানাবড়া হয়ে গেল আমার কথায়। যেন একটা ছোটখাট বোম মারলাম এই ঘরে। পিঙ্গল কিন্তু নির্বিকার, কোন সাড় নেই।

মা বলল “বলেছে? তাহলে?”
পিঙ্গল মার প্রশ্নটা শুনে টিভিটা বন্ধ করল। তারপর শান্ত গলায় বলল “আমি এখন আর এই ব্যাপারে আর কিছু বলব না, তোমরা এই বিয়েটা ঠিক করেছ, এখন তোমরা ঠিক কর যা করার। চল আমার খুব খিদে পেয়ে গেছে। খেয়ে নি”।
সবাই উদ্বিগ্ন মুখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল। আর আমার কোন একটা হিসেব কিছুতেই মিলছিল না। এখনই কি বলে দেব? নাহ। আগে নিশ্চিত হতে হবে আমাকে।
।।বর্তমান মোড অফ।।
।।ইতিহাস মোড অন।।
পিউর ছিল গন্ধবাতিক। তবে সেটা মারত্মক কিছু না। চুমু টুমু খাওয়ার সময় পিউ খুব একটা ঝামেলা করত না। একটা ক্লোরমিন্টে কাজ হয়ে যেত।
আর দেবোপমার সন্দেহ বাতিক। এত সন্দেহ বাতিক নিয়ে কি করে একটা মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারে ভগবানই জানে। ওকে যত বোঝাতাম মা আমার, তুমি যা সুন্দর দেখতে তাতে আমি আর অন্য মেয়ে কী করতে দেখতে যাব! কিন্তু কে বোঝে সেই কথা। একবার ফোন এনগেজ পেলেই ব্যাস, হয়ে গেল আমার গুষ্টির দফা রফা। কি, কেন, কবে, কোথায়, ইতিহাস, ভূগোল, ভৌতবিজ্ঞান সব কিছু ওকে বলতে হবে। আর কী কুক্ষণে আমি পিউ-র কথা ওকে বলে দিয়েছিলাম। সেটা যে কী সমস্যা তৈরি করতে পারে সেটা তো আর জানতাম না।
প্রথম দিন কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না সেভাবে। স্বাভাবিকভাবেই পাস্ট রিলশন নিয়ে জিজ্ঞেস করল। ও বলল সেরকম ভাবে কিছুই হয় নি কোনদিন। আর আমি, বিরাট চালিয়াতের মত বলে ফেলেছিলাম (তাও ইংলিশে, বাংলা মায়ের অ্যাংলো ছেলের মত) পিউর ইতিহাস। সেদিন সামান্য মুখটা সামান্য ফ্যাকাশে হয়েছিল কিন্তু তখন অতটা বুঝিনি। দু দিন কথা বলার পর তিনদিন থেকে দেখি পিউর কথা জিজ্ঞেস করে যাচ্ছে সমানে। চুমু ছাড়া আর কিছু করেছি নাকি, আমি ভার্জিন কিনা ইত্যাদি। আমার হল ছেঁড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। বিষয়টা যে চুমু থেকে আমার ভার্জিনিটি পর্যন্ত তাড়া করবে আগে কী করে জানতাম ! তাহলে আর রাত কে রাত দেবোপমাকে দেখা করার জন্য কান্নাকাটি করত কোন পাগলে।
কথা বার্তাগুলি হত এরকম,
আমি- হ্যালো, কী করছ?
ও- পড়ছিলাম। তুমি কী করছ?
আমি- এই টিভি দেখছিলাম।
ও- পিউ ফোন করেছিল?
আমি- যাহ্ বাবা, এর মধ্যে পিউ এল কোত্থেকে?
ও- না, আমি ভাবলাম হঠাৎ মনে টনে পড়ে গেল নাকি!
আমি- তোমাকে তো বলেছি পিউর এখন স্টেডি বয়ফ্রেন্ড আছে।
ও- তাতে কি? স্টেডি বয়ফ্রেন্ড থাকলেই বা কী হল, এক্সের সাথেও তো অনেকে রিলেশন চালিয়ে যায়।
আমি- দূর, না, না, কী যে বল, পিউ সে টাইপের মেয়ে না।
ও- তাই নাকি (গলায় শ্লেষ), এত প্রেম, কোন টাইপের সবই জান, তা ব্রেক আপ করলে কেন?
এই জায়গাটা এসে আমার মনে হত ফোন টোন রেখে পালিয়ে যাই। এ যে কী যন্ত্রণা তা কি করে বোঝাব। একই কথার একই উত্তর দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে যেতাম।
দেখা করতাম নন্দন চত্বরে কিংবা ফোরামে। আর এমনই কপাল খারাপ একদিন

পিউর সামনে পড়ে গেলাম। সেদিন বরং ঝামেলা কম ছিল, ওর মুডটাও ভাল ছিল, প্যাটিস আর কোল্ড ড্রিঙ্ক দিয়ে জাঁকিয়ে আড্ডা মারছি, ওর দিদির বিয়ে সামনে, কী কী শপিং করবে তারই ঝেড়ে ফিরিস্তি দিচ্ছিল (দেবোপমা কেসে আমি শিখেছিলাম মেয়েরা যত বড় সাইকোই হোক, শপিংয়ের ব্যাপার হলে তাদের সাইকোগিরি একটু কম থাকে। জেন্ডার বায়াস নই আমি, চাপ নিও না গুরু, ছেলে সাইকোও প্রচুর আছে), লেক থেকে হালকা হালকা হাওয়া দিচ্ছিল, আমিও ভাবছিলাম যাক আজকের দিনটা শপিংয়ের গল্পের উপর দিয়ে কাটিয়ে দিলেই বেঁচে যাব, ঠিক সেই মুহূর্তে এন্ট্রি নিল পিউ। ওর বয়ফ্রেন্ডের সাথে সিনেমা দেখতে এসেছে। আমাকে দেখেই এগিয়ে এসে "কী রে কী করছিস", ইত্যাদি ইত্যাদি শুরু করল, আমার তো ওদিকে সব কিছু মাথায় উঠে গেছে, দেবোপমার মুখ দেখেও দিব্যি বুঝতে পারছিলাম ঈশান কোণে সুনামির মেঘ জমা হচ্ছে, আমি কি করব, ক্যাবলার মত হেহে করলাম, পিউর বয়ফ্রেন্ডের সাথে হাত মেলালাম। আর পিউও আমার এমন "শুভাকাঙ্ক্ষী", যাওয়ার সময় আবার দেবোপমাকে বলে গেল "এই ছেলেটাকে একটু সাবধানে রেখো, ভীষণ ইনোসেন্ট" ইত্যাদি, যেগুলি ওর বলার কোন মানে ছিল না...
ব্যাস!
তেলে যেন জনি ওয়াকার পড়ল। জনি ওয়াকার দামী মদ, আমি কখনও খাইনি, তবে গরম তেলে মদ টদ পড়লে কেমন আগুন বেরোয় দেখেছি, আর দামী মদ পড়লে তো কথাই নেই, মদের টাকাটাও গেল, আগুনও চরম জ্বলল।
"আমি এখনই বাড়ি যাব", "তোমার সাথে আমার আর কোন রিলেশন নেই"... ইত্যাদি ইত্যাদি বলে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল দেবোপমা। আমি পিছু নিলাম, বেবাক নন্দন জনগণ আমাকে দেখতে লাগল, আমার ছুটতে ছুটতে "প্লিজ শোন আগে আমার কথা" ইত্যাদি শুনতে লাগল... কিন্তু হা হতোস্মি!
চলে গেল।
বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম ভালই হয়েছে, এই সাইকো নিয়ে চললে কিছুদিন পরে আমিও পাগল হয়ে যাব। সেই মতই করলাম। ফোন একবার করে দেখলাম ধরল না, ভাবলাম বেঁচে গেছি।
চুপচাপ ঘরে ফিরে ভাল ছেলের মত টিভি দেখে, ভাত খেয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু তার ফলে যে তিনি হাতের শিরা কেটে ফেলবেন তা কে জানত!

।।৪।।
।।সে।।
ছোট মামা এলে ভদ্রতার খাতিরে দিদি আর বাবার ঝগড়ার যুদ্ধবিরতি হয়, আমার সদা সর্বদা গোমরামুখো মার মুখে হাসি ফিরে আসে আর ভাল ভাল রান্না হয়। সেদিনটা আমিও কোথাও যাই না। বেশ অন্যরকম কাটে দিনটা। মামা প্রচুর বাজার করে আনে আর আনে দিদির জন্য একটা সম্বন্ধ। একটার পর একটা। লেগেই আছে। আর দিদিও কিছুতেই আর বিয়ে করবে না। মামা, মা কিংবা বাবা ওকে অনেকভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে গাঁজাখোরটার সাথে তো তোর সংসারই হয় নি ভাল করে কিন্তু দিদিকে কে বোঝাবে। চোখ মুখ শক্ত করে বসে থাকবে। বেশি বললে বলে ফেলবে, আমি যদি অতই বোঝা হয়ে গেছি তাহলে বরং আমি কোন লেডিস হোস্টেলে গিয়ে থাকি! ব্যাস তাহলেই সবাই স্পিকটি নট হয়ে যায় আর দিদি ল্যাপটপে নাক মুখ গুঁজে

বসে পড়ে। মার মুখ আবার গোমড়া হয়ে যায়।
আমি অয়নদার কথা মাঝে মাঝে রাতে ঘুমনোর সময় জিজ্ঞেস করি, কিন্তু কখনোই ঠিক ঠাক উত্তর পাই নি। বরং মুড খারাপ থাকলে বলেই বসে 'তোর অত জেনে কি হবে, ছোট আছিস ছোটর মত থাক"। ব্যাস, আমার মুখ বন্ধ হয়ে যায়।

অথচ দিদিটা এমন ছিল না। ও যখন ক্লাস টেনে, আমি সিক্সে। অস্বস্তিকর দিনগুলি শুরু হয়েছে আমার। আর তার মধ্যেই হত দারুণ সব মজা। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমরা পাড়ার সব ছেলেদের নম্বর দিতাম। ভোম্বলুদার ইয়া ভুঁড়ি, দিদি মাইনাস দিল। আমি বলতাম মোটা বলে কি মানুষ না? এক নম্বর দেওয়াই যায়। তারপর আমরা হিহি করে হাসতাম। পাশের ফ্ল্যাটবাড়ির একটা ছেলে আছে, আমাদের বাড়ির বারান্দায় আমাকে দেখলে ওর হাঁটাচলা অন্যরকম হয়ে যেত, ওকে আমি ছয় দিয়েছিলাম। দিদি দেখে বলল ব্যাটা মাড়োয়ারি, ওর জন্য দুই মাইনাস করতে হবে।
আমি মানতাম না। তাই নিয়েও খুনসুটি হত কত।
অয়নদার সাথে দিদির পরিচয় হয়েছিল বাস স্ট্যান্ডে। দিদি সবে কলেজে ঢুকেছে। অয়নদা তখন ক্যাম্পাসিংয়ে নতুন চাকরি পেয়েছে, আইটি সেক্টরে। পাড়ার ব্রাইটেস্ট ছেলে। সবাই বাড়ির মেয়েটাকে ফিট করছে ওর জন্য। আর অয়নদার পছন্দ হল দিদিকে। আর আমার দিদিটাও এমন, কিছুতেই পাত্তা দিত না অয়নদাকে। বেচারা কলেজ থেকে এসে দিদির ফেরার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকত বাস স্ট্যান্ডে। দিদি একদম সটান বাড়িতে চলে আসত। আমি জিজ্ঞেস করলে বলত বেশি পাত্তা দিলেই নাকি মাথায় উঠে যায়। ছেলেদের বেশি পাত্তা দিতে নেই। এরকম ভাও নিয়ে থাকতে হয়।
প্রায় এক বছর পরিশ্রম করার পর অয়নদার কলেজ লাইফ শেষ হল, চাকরিতে ঢুকতে যাবে, তখন অয়নদা রণে ভঙ্গ দিল। ওর বাবা মাকে পাঠাল বিয়ের কথা পাকা করতে। দিদির তখন মাত্র উনিশ বছর বয়স। কিন্তু বাবা মা কী বুঝল কে জানে সম্মতি দিয়ে দিল। দিদিও না করল না। আসলে ভেতরে ভেতরে তো ভেঙে যাচ্ছিলই সেটা বোঝা গেল।
অয়নদার বাড়ি থেকে চেয়েছিল ওই অত কম বয়সেই বিয়ে দিয়ে দিতে। পুনে তে থাকতে হবে যখন ছেলে বউ নিয়েই যাক। তা বিয়েও হল বিরাট ধুমধাম করে। দুবাড়িতেই প্রচুর লোক হল।
এত কিছু করে অয়নদা দিদিকে নিয়ে পুনে গেল আর ট্রেনিং পিরিয়ডে চাকরিটা খোয়াল। ওদের নাকি গোটা ব্যাচটাকেই ট্রেনিং পিরিয়ডে বসিয়ে দিয়েছিল। আত্মবিশ্বাসী অয়নদা ওই চাকরিটা যাবার পরই কেমন ভেবলু হয়ে গেল। কলেজ লাইফে যে নেশাগুলো করত, আরও বাড়িয়ে দিল সেগুলো। কলকাতা ফিরে মাঝে মাঝে মারধোরও করত দিদিকে টাকার জন্য। ওর নেশার টাকা শেষ হয়ে গেলেই হিংস্র হয়ে উঠত। অয়নদার বাবা মারা গেলেন হার্ট অ্যাটাকে। মা ছেলে অন্তপ্রাণ এমনই যে নেশাখোর ছেলের দোষ দেখত না। দিদির আর কিছু করার ছিল না। এক সকালে সব ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে চলে এল। ডিভোর্সটাও অদ্ভুত শান্তিতে হয়ে গেল। অয়নদাকে মাঝে মাঝে দেখি এখন ওই বাসস্ট্যান্ডেই দাঁড়িয়ে থাকে, আগে যেরকম থাকত। দিদি এলে চুপচাপ দেখে। মরা দৃষ্টিতে। দাড়ি বেড়ে গেছে, কাটে না, জামা কাপড়ও একই দিনের পর দিন পরে থাকে, কেমন পাগল পাগল হাব ভাব, দিদি ওকে ক্রস করে যখন বাড়িতে ঢোকে তখন আমি খুব তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করি দিদির চোখের

কোণায় একফোঁটাও জল আছে নাকি! কিন্তু নাহ। তার কোন রকম চিহ্ন মাত্র দেখতে পাই না।
এই পাথর দিদিটাকে আগে চিনতাম না। এখন চিনি।
জ্ঞান চক্ষু খোলার পর থেকেই আমি আর দিদি আমাদের প্রেমিক কেমন হবে তা নিয়ে অনেক গবেষণা করতাম, দিদি বলত ছ ফুট লম্বা হবে, ফরসা হবে, দাঁত মাজবে রোজ। দিদি হলুদ দাঁত কিছুতেই সহ্য করত না। অয়ন দা ছ ফুট না হলেও পাঁচ ফুট দশ, গায়ের রঙটা ফরসাই ছিল আর বেশ পরিষ্কার থাকত দেখেছি, দামী দামী পারফিউম ব্যবহার করত।
আর আমার প্রেমিক আমি ভেবেছিলাম ছ ফুট না হলেও চলবে, তবে পাঁচ ফুট চার আমার থেকে অন্তত পাঁচ ছয় ইঞ্চি তো লম্বা হতেই হবে, খুব একটা ফরসা না হলেও চলবে তবে ব্যক্তিত্ব থাকতে হবে। অয়নদা যেরকম দিদির পেছনে ছুটত আমার ঠিক ভাল লাগত না। ছেলে হবে ব্যক্তিত্বপূর্ণ। মেয়েদের দেখে যার জিভ দিয়ে জল গড়াবে না। এরকম ছেলে আশা করা আজকালকার দিনে স্বপ্ন দেখা ছাড়া কিছু না সেটা জানি কিন্তু স্বপ্নে যখন পোলাও খাব তখন ঘি বেশি তো দিতেই হবে। মাঝখানে বেশ কিছুদিন অর্কুট তারপর ফেসবুকও করেছি। প্রায় চার পাঁচ বছর। প্রথম প্রথম খুব বেশি বন্ধু ছিল না। যদিও স্কুল কলেজের বাইরেও প্রচুর ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট আসত। বয়সে অনেক বড়, আমার বাবা কাকার বয়সী লোকেরাও দেখতাম অ্যাড করত। একটু রাত হতেই দেখতাম সেই বাবার বয়সী লোকেরাও কিসব কথা টাইপ করে পাঠাচ্ছে। গা ঘিন ঘিন করে উঠত। শেষ মেষ ফেসবুক করাও বন্ধ করে দিলাম। জীবনটাকে আরও দুর্বিষহ করে তোলার কোন ইচ্ছা ছিল না।

এক একটা ঘটনা এক একটা বাড়ির পরিবেশকে কিভাবে পাল্টে দেয়। দিদির বিয়ের আগে অবধি আমাদের বাড়িতে কত হাসি ঠাট্টা হত, মজা হত, আমি মা বাবা দিদি মিলে সবাই একসাথে সিনেমা দেখতে যেতাম, দিদির বিয়ের পরের একমাসও আমাদের কত নিশ্চিন্ত জীবন ছিল, আমার পড়াশুনা, বাবার আরও পাঁচ বছর চাকরি, সবকিছু যেন প্ল্যান প্রোগ্রাম করাই ছিল, একটা ঘটনা সব কিছু ভেঙে চুরমার করে দিয়ে চলে গেল। বাড়িটায় সব সময় কেমন যেন একটা ঝিম ধরা ভাব এসে পড়ল। মাঝে মাঝে অফিস থেকে ফিরে যখন খাওয়ার টেবিলে বাবা অকারণ গজ গজ করে দিদির উপরে, আমার মনে হয় সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে যাই। বাবা আজকাল কিছুতেই বুঝতে চায় না দিদির বিয়েটার জন্য দিদি যতটা দায়ী তার সমান দায়ী আমরাও। যখন অয়নদাদের বাড়ি থেকে বিয়ের প্রস্তাব এল বাবাই তো বলেছিল যাক, রিটায়ারমেন্টের আগে অন্তত একটা মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে মন্দ হয় না। দিদি না হয় রাজি ছিল, বাবা তো বলতে পারত, না আমার মেয়ের এখনই বিয়ে হবে না। তখন কেন এক ফোঁটাও বাঁধা দেওয়া হয় নি। একটা মেয়ের উপর এত চাপ দিলে মেয়েটা বেঁচে থাকে কি করে। দিদির মত মানসিক শক্তি আমার নেই। দিদির জায়গায় আমি থাকলে আমি নির্ঘাত সুইসাইড করতাম। তাছাড়া আমার এসব ভালোও লাগে না। আত্মীয় স্বজন এলে ঘুরে ফিরে সবাই আমাকে নিয়ে চিন্তিত। “আহারে, ছোটটার কী হবে”। যেন আমি বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছি। দিদি বাড়ি চলে আসার পর আমার খারাপ লেগেছিল ঠিকই কিন্তু স্বস্তি পেয়েছিলাম যাক, দিদিটা অন্তত একটা নরক থেকে মুক্তি পেল। আর আমার এই সহানুভূতিগুলি নরক লাগে। কেমন আমাদের বাড়িতে ঢোকার আগে দামী দামী শাড়ি গয়না পরে হাসতে হাসতে সব আসবে, আর আমাদের দেখলেই মুখটা এমন করবে যেন কেউ মরে গেছে। আমি আজকাল তাই কেউ এলে

বাড়ি থেকে পালিয়ে যাই। রাস্তা ঘাটে একা একা ঘুরে বেড়াই। কখনও গড়িয়াহাট, কখনও সাউথ সিটি ঘুরে বেড়াই। ভিড় ফুটপাথের মধ্যে হাঁটি, ঝকঝকে শপিং মলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি। আমার মাথাও খানিকটা আজকাল বিগড়েছে আমি ভালই বুঝতে পারি।

আর এইরকম ঘুরতে ঘুরতে আমি সেই ছেলেটার সামনে পড়ে গেলাম। পর পর দু দিন। প্রথম দিন ছিল রবিবার। সাউথ সিটির সামনে রাস্তা পার হতে গিয়ে আমায় দেখে অদ্ভুত ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। আর দ্বিতীয় দিন ছিল সোমবার। রুবির মোড়ে। সেদিন আমার ইচ্ছা হয়েছিল দক্ষিণেশ্বর যাব।সকাল আটটায় উঠেই বেরিয়ে গেছি খালিপেটে। আমাদের বাড়ি সিমেন্সের কাছে।ওখান কিছু পাচ্ছি না, হাঁটতে হাঁটতে রুবি চলে এসছিলাম। দাঁড়িয়ে আছি চুপচাপ। হঠাৎ দেখি সেই ছেলেটা। আমাকে দেখে সেই অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছে। অদ্ভুত মানে নোংরা না। অদ্ভুত মানে অদ্ভুতই। নোংরা চোখ আমি বেশ চিনতে পারি। বারো থেকে বিরাশি, মুখোশ পরে রাস্তাঘাটে ঘোরাফেরা করে। মেয়েদের দেখলে সেই মুখোশটা আর কদর্য জানোয়ারের মুখটা লুকোচুরি খেলে।
ছেলেটা আমাকে প্রথমে ওইভাবে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর এগিয়ে এসে বলে বসল "আচ্ছা, আপনাকে না আমি কোথায় দেখেছি। কোথায় বলুন তো"।
আমি একটু চমকেই গেছিলাম হঠাৎ এরকম প্রশ্নে। বাস স্ট্যান্ডে তখন বেশ ভিড়। সবাই বেশ কৌতূহলী চোখেই এদিকে তাকাচ্ছে, আমি ভেবে দেখলাম কিছু একটা বলেই দি নইলে চাপ হয়ে যাবে আরও, বলে বসলাম "আমিও কোথায় যেন আপনাকে দেখেছি, মনে করতে পারছি না ঠিক"।
ছেলেটার পোশাক দেখে বোঝাই যাচ্ছে অফিস যাবে। আমার কথায় আরও খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আর কিছু মনে করতে না পেরে বলল "আপনি কি কোথায় যাচ্ছেন?"
আমার খুব হাসি পাচ্ছিল কেন জানি না। সকাল সকাল মিথ্যা বলতেও ইচ্ছা করছিল না। বললাম "হ্যাঁ, দক্ষিণেশ্বর যাচ্ছি"।
ছেলেটা বলল "ও", বলে আরও খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। আর সেই সময় গড়িয়া-দক্ষিণেশ্বরের বাসটা চলে এল।বাসটা খুব একটা বড় না। ভিড় ছিল, তবে একেবারে বিরাট কিছু না।আমি একটু হালকা ভিড় দেখে দাঁড়ালাম। আর সামলে উঠে দেখি ছেলেটাও উঠে এসছে।আমি অবাক হয়ে বললাম "আপনিও দক্ষিণেশ্বর যাবেন নাকি?"
ছেলেটা অপ্রতিভ হাসি হেসে বলল "অফিস যাবার ছিল, কিন্তু ইচ্ছা করছে না, আজ না হয় একটু দক্ষিণেশ্বরই ঘুরে আসি"।
আমার হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু হাসলাম না। তবে কেন জানি না, রোজ যেমন মনটা ভার ভার ঠেকে, তেমনটা লাগছিল না।

৫।।
।।উপমন্যু।।
দেবোপমার বাবা আমাকে থ্রেট দিয়েছিলেন জীবনে যেন দেবোপমার একশো গজের মধ্যে না আসি। সে যাত্রা দেবোপমা বেঁচে যায়। আর আমিও সিম চেঞ্জ করে নিই। কী ভাগ্যি!দেবোপমা মরে গেলে আমার কষ্ট হত ঠিকই তবে ওর বাবার থ্রেটে আমি আরও আনন্দ পেয়েছিলাম। তখন অবশ্য মাথা টাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিলাম। ভদ্রলোক

বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। আমি অবশ্য কিছু মনে করি নি তাতে। ওনার জায়গায় আমি থাকলেও রেগে যেতাম অবশ্যই। অর্কুট প্রোফাইল ডিলিটই করে দিয়েছিলাম। কোন রিস্ক টিস্ক নিই নি। সেদিন রাতটা আমার যা গেছিল তা আমিই জানি। আর ওই মেয়ে আমার কারণে না হলেও একদিন না একদিন মরবেই। এত সন্দেহ নিয়ে ও নিজেও বাঁচবে না আর আমাকেও বাঁচতে দেবে না।
আজও মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্নে দেবোপমাকে দেখে চমকে চমকে উঠি।
এই ঘটনার পরে আমি ঠিক করে নিয়েছিলাম জীবনে আর কোনদিন প্রেম ট্রেমে পড়ব না, মেয়েদের নিয়ে ক্রাইসিসেও যাব না। সব মেয়েই কমবেশি সাইকো, আর আমি তো ফুল সাইকো সুতরাং দুটো সাইকো এক হলে যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে তার থেকে দূরে থাকাই ভাল।
অর্কুটে প্রোফাইল খুললাম অন্য একটা নামে। ছবিটাও দিলাম শাহরুখ খানের। আর মাঝে মাঝে দেবোপমার প্রোফাইলে গিয়ে ঘুরে আসতাম। এই ঘটনার প্রায় ছয়মাস পরে দেখলাম ও নিজের ফটো দিয়েছে প্রোফাইলে। তারপর আর চাপ নিলাম না। ভাত ছড়ালে যেমন কাকের অভাব হয় না, সুন্দরী মেয়ের প্রোফাইল পিক দেখলে তেমনি ছেলেদের অভাবও হয় না। কোনটা ইয়া মাসল, কোনটা টুপি ফুপি পড়ে পোজ নিয়ে দাঁড়ানো ছেলেদের লাইন লেগে যাবে। তারা ইয়ো বেবি, ইয়ো বেবি করে দেবোপমাকে তুলে ফেলুক আর তারপরে দৌড়ে বেড়াক। আমার কী! আমি নিশ্চিন্ত হলাম।
বেড়াল মাছ ছাড়া থাকতে পারে না,কিন্তু প্রায় ন'মাস আমি গার্লফ্রেন্ড ছাড়া ছিলাম। আমার জীবনে পিউ একটা অভ্যাস তৈরি করে দিয়ে গেছিল। দেবোপমা সেই ঝামেলাগুলি করে চলে যাবার পরেও আমার ওই নমাসে কখনও কখনও মনে হচ্ছিল দেবোপমাই হয়ত ঠিক ছিল, ও হয়ত আমাকে বেশি ভালবাসত বলেই আমার ওপর ওই রকম জোর জারি করছিল, এবং একটা সময় এসে ঠিক করে ফেলেছিলাম অর্কুটে আবার ওকে ফ্রেন্ড রিকু পাঠাব ঠিক সেই সময় তানিয়াদি এল। তানিয়াদির সাথে অর্কুটেই আলাপ। কী থেকে আলাপটা হয়েছিল এখন আর মনে করতে পারছি না, তবে কোন একটা গ্রুপে ওর প্রোফাইল পিক দেখে অ্যাড করেছিলাম। মুখে একটা লাল ওড়না জড়ানো ফটো ছিল, চোখে সানগ্লাস। বেশ হট অ্যাপিয়ারেন্স। অ্যাড করার পর আমাকে স্ক্র্যাপ পাঠিয়েছিল "তোকে দেখে তো বাচ্চা ছেলে মনে হয় তা হঠাৎ এ পাড়ায় কী মনে করে?"
স্ক্র্যাপটা পড়েই মনে হয়েছিল এ এক্কেবারে চরম স্মার্ট ব্যাপারস্যাপার হবে। বেশ কিছুদিন চ্যাটে ভাটানোর পরে দেখলাম আমাদের ওয়েভলেন্থ বেশ ম্যাচ করে, ওর মেটাল পছন্দ, আমারও, ও বাংলা সাহিত্যে পড়ে খুব বেশি করে, হুমায়ূন আহমেদের ফ্যান, আমিও, ও ইলিশ মাছ পছন্দ করে, আমিও, ও মাটন খায় না, আমিও পছন্দ করি না। ফোন নাম্বার নিলাম, ফোনও করলাম, চরম সিডাক্টিভ গলা।
আমার সাথে অনেকক্ষণ কথা বলেছিল, তারপর বলেছিল "তুই আমার থেকে পাঁচ বছরের ছোট, তোকে কি ভাই বলে ডাকব?"
আমি আমতা আমতা করে বলেছিলাম "বয়স কম হলে বিয়ে না হওয়াই ভাল তবে ভাই না হয়ে বন্ধুত্বটা তো হতেই পারে"।
বেশ খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলল "চ, লেটস মিট, তুই আমাদের অফিসে আসতে পারবি কালকে?"
তানিয়াদির ক্ষেত্রে আমার আগের দুবারের মতন ঠিক প্রেমানুভূতি না হলেও একটা উত্তেজনা যে কাজ করছিল সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে যাই হোক, আমি ঘরপোড়া

গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পাই, তাই সে রাতটা নিশ্চিন্তে ঘুমালাম।
ওহ, এই এত ইতিহাস ভূগোল বলতে বলতে একটা জিনিস আমি ভুলেই গেছিলাম,আর যারা আমার গল্পটা শুনছে তারাও এটা ভাবতে পারে যে আসলে আমি করি টা কী? সারাদিন কি প্রেম করাই আমার কাজ? আসলে তা না, প্রেম অধ্যায়ের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে পড়াশুনার কথাটাই আমি মিস করে গেছি। সেই সময় আমি আইটি ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট ছিলাম কলকাতার একটা কলেজে, পিউর সাথে যখন আমার অ্যাফেয়ারটা ছিল তখন ফার্স্ট ইয়ার, আর দেবোপমার ঘটনাটা ঘটে একদম সেকেন্ড ইয়ারের শুরুতে। গোটা সেকেন্ড ইয়ারটা আমি ঝিমিয়ে কাটাই, আর যখন ফোর্থ সেম আসব আসব করছে তখনই আমি তানিয়াদির সাথে দেখা করতে গেলাম।
তানিয়াদিদের অফিসে সন্ধ্যে নাগাদ পৌঁছলাম। সল্টলেক সেক্টর টুতে অফিস। বেশ কয়েকটা রোটারি ঘুরে, জলের ট্যাঙ্ক ফ্যাঙ্ক খুঁজে অবশেষে পৌঁছতে পারলাম। ছোট অফিস, লোকজন সবাই দেখলাম বেশ ব্যস্ত, আমাকে নিয়ে একটা কনফারেন্স রুমে বসাল তানিয়াদি। ওদের অফিসের একটা জিনিস দেখলাম, কারও কোন বাড়তি কৌতূহল নেই, আমি গেলাম বাইরে থেকে ফোন করে তানিয়াদি আমাকে ওদের অফিসে নিয়ে গেল, সোজা কনফারেন্স রুমে বসাল, কেউই দেখলাম খুব একটা গা করল না।
আমি বেশ চাপে তখন, তানিয়াদি সাধারন একটা পোশাকই পরে ছিল। আমাকে প্রথম যে কথাটা বলল "কেমন লাগল আমাদের অফিস?"
আমি বললাম "ভাল"। এছাড়া আর কিছু বলারও ছিল না। কী বলতাম! বলল "তুই চাউমিন খাস তো? আনতে দিয়েছি কিন্তু"।
আমি ভালমানুষের মত মুখ করে বললাম "হ্যাঁ, আবার এসব কেন?"
তানিয়াদি মুখ বাঁকাল, "ন্যাকামো করিস না, খা, খেলে কিছু হয় না"।
আমি চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগলাম, ঠিক কথা আসছিল না। তানিয়াদি সামনা সামনি প্রোফাইল পিকের থেকেও বেশি সুন্দরী, আমি বুঝতে পারছিলাম আমার অর্কুট ভাগ্য বেশ ভাল। তানিয়াদি বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাকে দেখছিল। বলল "তোর গার্লফ্রেন্ড আছে না?"
তানিয়াদির সাথে এর আগে পিউ বা দেবোপমা নিয়ে কোন কথা হয় নি। বলতেও চাই নি। এবারে চেপেই গেলাম "না, এখনো নেই"। তারপর উল্টো চাপ দিলাম "তোমার আছে?"
তানিয়াদি অবাক হল, "সে কি রে? এখনো জি এফ নেই? যাহ্"।
-"তোমার আছে তারমানে, বি এফ?"
-"ছিল, তবে এখন নেই"।
-"ওহ"। আমি চুপচাপ বসে রইলাম। তানিয়াদি বলল "তা পড়াশুনা করছিস তো না সারাদিন অর্কুটই করিস? তোকে তো যতক্ষণই দেখি, সারাদিন রাত অর্কুটে বসে থাকিস, কী এমন মজা পাস?"
-না না, সবই করি, ল্যাপটপ অন রেখে পড়ি বলে তুমি বুঝতে পার না।
আবার খানিকক্ষণ বাজে বকা। ভাবছিলাম ওর এক্স নিয়ে জিজ্ঞেস করব নাকি, পরক্ষণেই চেপে গেলাম, কী দরকার বাজে কথা বাড়িয়ে।
চাউ এসে গেল। আমি অবাক হয়ে বললাম "সেকি? এত তাড়াতাড়ি?"
তানিয়াদি হাসল "তুই যখন করুণাময়ী থেকে ফোন করলি তখনই বলে দিয়েছি, আমরা বেরব এখন"।
একটা প্লেটে দিয়ে গেছে চাউমিনটা। আমি কাটা চামচ আর চামচ ম্যানেজ করতে

করতে বললাম “কোথায় যাব?”
তানিয়াদি অবাক হল “সে কী তুই বললি না তোর ‘হিমু সমগ্র”টা দরকার, আজ নিয়ে যা, পরে কোন একদিন দিয়ে যাবি”।
“ও তোমার বাড়িতে?”
“হ্যাঁ দেরী করিস না, খেয়ে নে”।
“তোমার গাড়ি আছে?”
“অফিসের আছে, পৌঁছে দেব, প্রব্লেম নেই”।
আমি নিশ্চিন্তে চাউ খেতে লাগলাম।
#
তানিয়াদির ফ্ল্যাটটা রাজারহাটের শুরুতেই। তখনও সে জায়গাটা খুব একটা গড়ে ওঠে নি এখনকার মত। ফাঁকা ফাঁকা মাঠ। আর ওর ফ্ল্যাটে পৌঁছে একটা ধাক্কা মত খেলাম।দরজা তালা দেওয়া আর তানিয়াদি চাবি দিয়ে সেটা খুলছে। তারমানে ও এই ফ্ল্যাটে একা থাকে। এটা আমার কল্পনাতেও আসে নি। ফ্ল্যাটটা বেশ বড়। তবে আসবাব পত্র কম। বসার ঘরে শুধু টিভি আর একটা সোফা।
আমার একটা চোরা টেনশন হচ্ছিল। শেষমেষ জিজ্ঞেস করেই বসলাম “তুমি এই ফ্ল্যাটে একা থাক?”
তানিয়াদি লাইটের সুইচগুলি অন করতে করতে বলল “হ্যাঁ, তোকে বলি নি তাই না”।
“না আমি জানতাম না তো”। আমি আত্মবিশ্বাস খুঁজছিলাম।
তানিয়াদি হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার ঠোঁটে একটা চুমু খেল, আমার হাত পা অবশ হয়ে আসছিল, আমি আর বাঁধা দিতে পারলাম না।
আমার মাথা আর কাজ করছিল না, এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয় যখন স্রোতের সাথে বয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। তানিয়াদি পাগলের মত করতে শুরু করল। আমার জামা জোর করে খুলিয়ে সারা শরীরে চুমু খাওয়া শুরু করল, প্রায় পয়তাল্লিশ মিনিট বাদে ওর ফ্ল্যাট থেকে যখন বেরলাম তখন প্রথম যে কথাটা আমার মাথায় এল সেটা হল, আমি আর ভার্জিন নই। ভাল লাগা খারাপ লাগা কোন অনুভূতিই অবশ্য এল না তবে খালি মনে হচ্ছিল কত তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছনো যায়। এই একটা দিন আমাকে বড় করে দিয়েছিল।
আমি সাধারণত সব ঘটনার কথাই নিশানের সাথে শেয়ার করি, এই ঘটনাটা করলাম না। করলেও কী আর এমন হত, কিন্তু রাতে বাড়ি ফিরে যখনই ভাবছিলাম ঘটনাটার কথা আমার মনে হচ্ছিল আবার আমি ওই ফ্ল্যাটে চলে যাই। অনেকক্ষণ ছটফট করে তানিয়াদিকে ফোন করলাম রাত একটা নাগাদ, প্রথমে রিং হয়ে গেল, ধরল না। তারপর নিজেই কলব্যাক করল, সেই সিডাক্টিভ ভয়েস “কিরে, মাঝরাতে কি হল?”
আমি বললাম “এখন তোমার কাছে যেতে ইচ্ছা করছে”।
তানিয়াদি হাসল কিছুক্ষণ, তারপর বলল “ঠিক আছে, কাল ছুটি নিচ্ছি, সকাল সকাল চলে আয়, সারাদিন একসাথে কাটাব, ওকে”।
আমার মনে হচ্ছিল হৃৎপিণ্ডটা হাতে উপড়ে চলে আসবে। সে রাতটায় ঘুম আসতে আসতে ভোর চারটে হয়ে গেল।
পরের দিন ঘুম ভাঙতে ভাঙতে সকাল দশটা। ফোনে চারটে মিসড কল তানিয়াদির। কিন্তু হঠাৎ মনটা কেমন তেতো তেতো লাগছিল, মনে হচ্ছিল এ আমি কী ভুল করলাম! শেষে ফোনটা অফ করে রেখে দিলাম। দুপুরে খেতে বসেছি মা বলল “কি রে, তোর শরীর খারাপ নাকি, কেমন লাগছে?”
আমি পাতি ঢপে কাটালাম “না না, ওই সেম এসছে, পড়ছিলাম রাতে, তাই এরকম

লাগছে হয়ত”।
খেয়ে টেয়ে ল্যাপটপটাও অন করলাম না, চুপচাপ খাটে শুয়ে রইলাম। আর বারবার চোখ বন্ধ করলেই তানিয়াদির বুক, পেট, নাভি সব চোখের সামনে চলে আসা শুরু করতে লাগল। যতবার ভাবছি এটা নিয়ে আর ভাবব না, ততবার ঘুরে ফিরে ফিল্মস্ট্রিপের মত এটাই আসতে লাগল।মনের সাথে যুদ্ধ করে করে শেষে আর পারলাম না। বেলা তিনটে নাগাদ জামা কাপড় পরে বেরিয়ে গেলাম, মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল “কিরে এখন আবার কোথায়?”
আমি বললাম “কলেজ যাচ্ছি, সাজেশন আছে”।
দৌড়তে লাগলাম রাস্তা জুড়ে। একটা ট্যাক্সি নিয়ে নিলাম,আর ট্যাক্সিতে উঠেই অপরাধবোধটা আবার ফিরে এল। এই রিলেশনশিপটার মধ্যে তো শরীর ছাড়া কিছু নেই, আমি কি তানিয়াদিকে বিয়ে করব? সেটা কি সম্ভব হবে? তাছাড়া আমি তো ওর সম্পর্কে কিছুই জানি না। ও কোথায় থাকে, এটাই ওর বাড়ি কিনা, ওর বাবা মা কি করে আমি কিচ্ছু জানি না। পাতি একটা অর্কুট আলাপে এত কিছু করে ফেললাম। এবার দুই অবচেতনে এমন ঝগড়া শুরু হল যে আর পারলাম না, চিংড়িহাটায় ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিলাম।
এটাও মনে এল না যে এই ট্যাক্সিটা করেই আবার বাড়ি ফেরত যাওয়া যেত। নিজের মনে হাঁটতে লাগলাম, আর বারবার নিজের সাথে কথা বলতে লাগলাম, সেই সময়টা রাস্তাঘাটে কেউ আমাকে দেখে থাকলে নির্ঘাত পাগল ছাড়া আর কিছু ভাবত না। একসময় হাঁটতে হাঁটতেই আবিস্কার করলাম, আমি আবার তানিয়াদির ফ্ল্যাটের দরজায় এসে উপস্থিত হয়েছি। ওই দীর্ঘ রাস্তাটা আমি জীবনেও হাঁটতাম না, কিন্তু সেদিন আমার কি হয়েছিল আমিও জানি না। কখন যেন হাতটা উঠে কলিং বেলও বাজিয়ে দিয়েছে।
তানিয়াদি দরজা খুলল, একটা ক্লিভেজ বের করা টপ আর একটা থ্রি কোয়ার্টার পরে আমার দিকে তাকিয়ে বলল “কিরে, গিলটি ফিলিংস?”
আমি আর কিছু বললাম না, ওখান থেকেই ওকে জড়িয়ে ধরে দরজায় লাথি মেরে ঘরের ভিতর নিয়ে ঢুকলাম।ঠিক ও কালকে আমার সাথে যা করেছিল, তাই করতে লাগলাম, কিন্তু এবারে বেশিক্ষণ পারলাম না।আগের দিন সারারাত,সেদিন গোটা দিন এটা নিয়ে ভেবেছি, তার ওপর অতি উত্তেজনা। ওর শরীরটাকে ছেড়ে দিয়ে পাশে শুয়ে পড়লাম, তানিয়াদি তখন শীর্ষে, বেশ কিছুক্ষণ আমাকে গরম করার চেষ্টা করল, তারপরে না পেরে ওর দাঁত দিয়ে আমার ঠোঁট দুটো কামড়ে ধরল, সম্পূর্ণ বিবস্ত্র দুজনেই, আমার ওপরে শুয়ে পড়ে বলল “খোকাবাবু, জলে নামলে ডুব সাতারটাও জানতে হবে”।
ওর কথাটায় অন্য টোন ছিল, ঠিক ধোপদুরস্ত পোশাক পরা অফিসগার্লের মত না। কিন্তু সেদিন আমি বুঝেছিলাম, সব উত্তেজনার শেষে জীবনটা কেমন পানসে পানসে লাগে।

৬।।
ভিখিরি বলে তাদের যাদের টাকা পয়সা নেই, সহায় সম্বলহীন, ঘরদোর নেই, মানে কিছুই নেই যাদের। আর নিকিরি বলে সেই মালগুলোকে যাদের আছে অনেক কিছুই কিন্তু থেকেও আসলে কিছু নেই। এই রাঘব বোস হল তার মধ্যে একটা। এসেছিস সেই

আসানসোল থেকে কলকাতায় ছেলের মেয়ে দেখতে তা ঠিক আছে কিন্তু এ কী রে বাপু! কথায় কথায় হুমকি। পার্কিংয়ে টাকা যেখানে লাগবে সেখানে করবি না,কোন গলিতে গুঁজে রাখ গাড়িটা, এ কী গাড়ি না খেলনা যে গুঁজে রাখবে! আর পার্কিংয়ে টাকা তো লাগবেই। কলকাতা তো আর গ্রাম না যে পুকুরের সামনে গাড়িটা রেখে হেগে, মুতে, স্নান, টান করে আসা যায়! আর এই লোকটা গড়িয়াহাটের ভিড় রাস্তায় বলে কিনা গাড়ি দাঁড় করা, মিষ্টি নিতে হবে!
বিশু এই জন্য এদের সাথে কোথাও আসতে চায় না। কিন্তু কী করবে, পাপ্পুর সব গাড়ি আজকে ভাড়া হয়ে গেছে আর মরবি তো মর তার গাড়িতেই আসতে হল রাঘব বোসকে। পেটের ব্যাপার, না-ও করতে পারে না। এই লোকটার সাথে যতবার সে কোথাও গেছে ততবার ঝামেলা লেগেছে। হয় পেমেন্ট নিয়ে, নয় সময় নিয়ে, প্রত্যেকবারই বেরনোর সময় যদি বলে সকালে গিয়ে বিকেলে ফিরে আসবে, আদতে দেখা যায় ব্যাপারটা পুরো উল্টো। নাইট স্টে করাবে আবার তার জন্য যে চার্জটা লাগে সেটাও দেবে না। হাড় বজ্জাত লোক। অথচ ব্যাটার বড় রঙের দোকান আছে এক্কেবারে বাজারের মাঝখানে, মাক্ষিচুষটার ভাল রোজগারও হয় সেটা থেকে, হোল ফ্যামিলিই তো সেটায় লেগে আছে, কিন্তু যখনই টাকা ফেলতে হয়, অমনি নিকিরিগিরি শুরু।
শক্তিগড়ে গাড়ি দাঁড় করালে কম বেশি সবাই আর কিছু না খাওয়াক চা-টা অন্তত অফার করে, এদের গুষ্টি সে সবের ধারে কাছ দিয়ে যায় না। বিশু ঠিকই করে রেখেছে, এই শেষ, এরপরে পাপ্পু যাই করুক না কেন, এই রাঘব বোসের ভাড়ায় আর আসবে না। বলে কি না, টোলের টাকা তো আমার দেওয়ার কথা না, ওটাতো ভাড়ার মধ্যেই পড়ে, মামদোবাজি আর কী! সে বলে দিয়েছিল হয় টোলের টাকা দিন, নইলে বলুন, গাড়ি ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছি। ব্যাজার মুখে টাকা বের করে দিয়েছিল তখন। মনে হচ্ছিল ব্যাটার হার্ট অ্যাটাকই না হয়ে যায়। আর রাঘব বোসের বড় ছেলে ঝন্টু বোস, যে ব্যাটার বউ বিয়ের রাতেই পালিয়েছিল, সেটার জন্য মেয়ে দেখতে যাচ্ছে। কেন যাবে না? মালটাকে দেখলেই তো মনে হয় দিনে দুপুরে গাঁজা মেরে বসে থাকা। ভাটার মত লাল চোখ, ছ ফুট লম্বা চেহারা, আর লিকলিকে রোগা। হেঁটে গেলে মনে হয় পেন্সিলের উপরে কেউ কালো কুত্তার লোম আঠা দিয়ে বসিয়েছে। বিশু ভাবছিল কলকাতার মেয়েদের কি আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই যে এই টাইপের পাব্লিকের সাথে বিয়ে হবে! তবে ছেলে যখন ডিসপুট মাল তখন মেয়েও নির্ঘাত তাই হবে। সে দেখেছে ডিসপুট মালের সাথে সব সময় ডিসপুট মালেরই বিয়ে হয়। মেয়েও হয় বিধবা নয়ত ডিভোর্স কেসই হবে।
তবে সে একটা দিক থেকে নিশ্চিন্ত হল মেয়ের বাড়ির গলিতে ঢুকে, এখানে গাড়ি পার্কিংয়ের খুব একটা গেরো নেই। পাড়ার মধ্যেই একটা গলিতে গাড়ি দিব্যি সাঁটিয়ে রাখা যাবে। সে বুঝল রাঘব বোসও এটা দেখে খুশি হয়েছে। বাড়িটা খুব বেশি বড় না, তবে খুব একটা ছোটও না। বিশু একটা নিঃশ্বাস ফেলল। তার খুব ইচ্ছা ছিল, কলকাতার মেয়ে বিয়ে করার, কত ঠাট বাট জানে এরা। কিন্তু কী করবে, ট্যাঁকের জোর তার আর কোথায়, সেই ঝাঁটার কাঠির কপালেই নাচছে কলকাতার মেয়ে।
গাড়ি খালি হয়ে গেলে সে রাস্তাটায় খানিক টহল দিল, বেশ অনেকগুলি ফ্ল্যাটবাড়ি উঠে গেছে এর মধ্যেই। কলকাতার মেয়ে তার পছন্দ হলেও কলকাতা তার কখনোই খুব একটা পছন্দের জায়গা নয়। এখানে এলেই তার চোখ জ্বলে, সব সময় ট্রাফিক পুলিশের ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকতে হয়, আর কতরকম নোটিস, এই রাস্তায় ৪০ কিলোমিটারের বেশি স্পিডে যেতে পারবে না, এই গরমের মধ্যে সিট বেল্ট বেঁধে

রাখো, কত যে ফ্যাঁকড়া। নেহাৎ পেটের জ্বালা বড় জ্বালা, নইলে কলকাতা আসতে তার বয়েই গেছে। বেশির ভাগ ভাড়াই তো কলকাতা, ভোরের ফ্লাইট, সেই রাত থাকতে উঠে গাড়ি নিয়ে বেরোও, অবশ্য বেশ কিছু ভাল ভাড়াও আছে। পালকাকুর ছেলে যতবার ফেরে বিদেশ থেকে ততবার বিশু আলাদা বকশিস পায়, এইগুলি আছে বলে তো এখনো এই লাইনে কিছু হলেও মজা আছে নইলে এই সব ড্রাইভারি ছেড়ে কবে জামাইবাবুর ধাবায় লেগে পড়ত সে। দিদি তো অনেকবারই বলেছে। অবশ্য তার একটা স্বপ্নও আছে। এইভাবে টাকা জমিয়ে জমিয়ে নিজের একটা গাড়ি কিনবে, সেকেন্ড হ্যান্ড হলেও হবে, পানাগড়ের সিং চাচার সাথে কথাও হয়ে আছে, মোটামুটি পঞ্চাশ ষাটে একটা ধোপদুরস্ত অ্যাম্বাসাডার হয়ে যাবে বলেছে, তাহলে এই পাপ্পুর কথা অনুযায়ী এই খরুশ ভাড়াগুলোয় আর আসতে হবে না তাকে।
খানিকটা হেঁটে সে বড় রাস্তায় বাস স্ট্যান্ডের পাশের পানগুমটিটায় দাঁড়াল। খৈনি আর বিড়ির প্যাকেট কিনল। চুন তার পকেটেই থাকে সব সময়। খৈনি ডলা শুরু করল বাস স্ট্যান্ডটায় বসে। রাস্তায় গাড়ির ছড়াছড়ি। ডলা প্রায় শেষের দিকে কে একটা হাত পেতে দিল তার সামনে, সে নিবিষ্ট মনে খৈনি ডলছিল, হাতটা দেখে চমকে তাকাল। বেশ অভিজাত চেহারার একটা লোক, তবে চেহারাটায় কেমন মরচে ধরে গেছে, জামাটাও ময়লা। চোখ দুটোও কেমন নেশাখোরের মত। সে দেখেছে, খৈনি একা খেয়ে যা সুখ, পার্টনার পেলে আরও বেশি সুখ, লোকটাকে সে "আর একটু টাইম লাগবে দাদা" বলায় লোকটা তার পাশে বসল।
ডলা শেষ হলে লোকটা খৈনিটা মুখে পুরে দিয়েই বলল "মিত্র বাড়িতে এসছেন নাকি? কোত্থেকে?"
বিশুও মুখের কোণে দিয়েছিল খৈনিটা, লোকটার কথা শুনে বুঝল, এ এই পাড়ারই হবে। বলল "হ্যাঁ দাদা, আসানসোল থেকে"।
"তা ছেলে কি করে?"
"রঙের বিজনেস দাদা। বড় দোকান আছে আসানসোলে"।
"হু"।
অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না লোকটা। বিশুও বেশি বকল না। বেশি কথা বলে কি হবে, রাঘব বোস নিকিরি সেসব একে বলে লাভ নেই। লোকে বলে অতীত থেকে শিক্ষা নিতে, সে ওই অতীত থেকেই শিক্ষা নিয়েছে। একবার এক ছেলেপক্ষকে নিয়ে বিয়েতে গিয়ে ছেলের নামে উল্টোপালটা বলে দিয়েছিল এক অচেনা লোককে, পরে দেখা গেল সেই লোকটা মেয়ের আপন মামা। সে কি অবস্থা। সেই থেকে সে ঠিক করে নিয়েছে, এই সব বিয়ে শাদী কেসে স্পিকটি নট। কোন দরকার নেই মুখ খোলার।
রাস্তায় একটা বড় জ্যাম হয়েছে। সামনে আবার কিছু ঘটল নাকি কে জানে। কলকাতা এলে এই এক ভয়। কখন যে কি লাফড়া শুরু হয়ে যায় কে জানে।
থু থু করে বেশ খানিকটা থুতু ফেলে লোকটা বলল "মিত্র বাড়ির মেয়েটা খানকি বুঝলেন? এদিক ওদিক লাগিয়ে বেড়ায়। খুব বাজে মেয়ে। ওই যাদের সাথে এসছেন, তাদের বলে দেবেন, নইলে পরে অশান্তিতে পড়ে যাবেন"।
বিশু হঠাৎ এই কথায় চমকে লোকটার দিকে তাকাল। লোকটা ভাবলেশহীন মুখে উঠে দাঁড়াল, তার কাঁধে একটা চাপড় মেরে "আসি কেমন?" বলে রাস্তায় হাঁটা লাগাল।
বিশু ফ্যালফ্যাল করে সে দিকে তাকিয়ে থাকল।
৭।।
অফিস থেকে বেরনোর ঠিক পাঁচ মিনিট আগে বসের যে কেন তাকে মনে পড়ে বুঝে

উঠতে পারে না পিঙ্গল। আধঘণ্টা ভাট বকে সময়টার সর্বনাশ করে তারপরে ছাড়ান দেয় তাকে। আর এই সময়ে তার মনে হয় পীযূষদাকে মেরেই ফেলে। লোকটা এমনি ভাল কিন্তু এই এক বদ দোষ। জ্ঞান দিতে বসলে আর সময় মনে থাকে না ওর। আর সারা দিনের পর সন্ধ্যের দিকে চাপটাও কম থাকে অনেক, তাই ভাট বকতেও সমস্যা থাকে না। আর সবকিছুতেই অবধারিতভাবে ঘুরে ফিরে তার বিয়ে প্রসঙ্গ আসবে। ওর এক দূরসম্পর্কের শালী আছে। তাকে যেভাবেই হোক তার গলায় ঝুলানোর চেষ্টা শুরু হয়েছে এখন। বিয়েটা ভেঙে যাবার পর থেকে কলিগরা যেভাবে সিমপ্যাথি দিচ্ছে তাতে তার মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে এবার অন্য চাকরি দেখতে হবে তাকে। কী কুক্ষণেই না ভাস্করকে মুখ ফসকে বলে দিয়েছিল কথাটা, তারপর থেকে এই শুরু হয়েছে।
এই রোববার তাকে বাড়িতে নেমন্তন্নও করে বসেছে পীযূষদা, তার যাবার একেবারে ইচ্ছা না থাকলেও কিছু করার নেই তার। বস যখন, না যাওয়াটা অভদ্রতা হবে।
অফিস থেকে বেরিয়েই সে বুঝল আজকেও বৃষ্টিতে ভিজতে হবে তাকে, দুদিন ধরে এমনিতেই ভিজেছে। অফিসের গাড়ি তাকে যেখানে নামায়, সেখান থেকে আরও খানিকটা হেঁটে তারপরে বাড়ি যেতে হয়। ওই রাস্তাটুকুই ভিজে যায় সে। আর ছাতা নিতে তার বরাবরের ল্যাদ। পীযূষদা প্রায় সাতটা বাজিয়ে দিয়ে শেষে বলল তার সাথেই যেতে।
সে আর না করতে পারল না, অফিসের গাড়িটা বেরিয়ে গেছে, আবার ওটার জন্য বসে থাকলেও অনেকক্ষণ লাগবে।
তার নিজেরও গাড়ি কেনার ইচ্ছে আছে, ঠিক করেছিল বিয়ের পরেই কিনবে একবারে, এখন ভাবছে এই সব ঝামেলায় না গিয়ে গাড়িটা কিনে নিলেই হয়। মাঝে মাঝে লং ড্রাইভেও যাওয়া যাবে।
পীযূষদার গাড়িটা সেডান, নিজেই চালান, গাড়ির পিছনের সীটে বসতে গিয়েও বসল না সে। বস ড্রাইভ করবে আর সে পিছনে বসবে এটা একটু কেমন যেন লাগে তার কাছে। গাড়িটা অফিস থেকে বেরতেই দেখল ফোনটা পকেটে নড়ে চড়ে উঠল, সে সিটবেল্ট বাঁধছিল, সেটা বাঁধা হওয়ার পরে সি এল আইতে নম্বরটা দেখে চমকাল খানিকটা, তনুশ্রী। প্রথমে ভাবল ধরবেনা, তারপর ধরেই ফেলল, হ্যালো বলতে ওপাশ থেকে বেশ তড়বড়িয়েই শুরু করল তনুশ্রী "আমি কি ডিস্টার্ব করলাম?"
সে অবাক হল, হঠাৎ কী হল আবার। বলল "না, ঠিক আছে, কী ব্যাপার বলুন?"
"আমি কি এখন একটু আপনার সাথে দেখা করতে পারি?"
"এখন?" প্রস্তাবটায় চমকাল পিঙ্গল। এর আবার হঠাৎ কী হল? বিয়েটা তো ভেঙেই গেছে। কাটাতে চাইল সে "না, এখন একটু অসুবিধা ছিল"।
মেয়েটা যেন ভেবেই ছিল সে এটা বলতে পারে, "না বলবেন না প্লিজ একটু দেখা করুন, আমি বেশি সময় নেব না"।
তার সমস্যা হল সে কাউকে না বলতে পারে না। এর আগেও এরকম হয়েছে অনেকবার। মনে মনে বিরক্ত হলেও সে বলল "ঠিক আছে, কোথায় যেতে হবে বলুন"।
"আমাদের পাশের পাড়ায় সিসিডিটা চেনেন তো? ওখানে আসুন, আপনি অফিস থেকে বেরিয়েছেন তো?"
"হু, আমি ফোন করছি পৌঁছে"।
ফোনটা রেখে সে পীযূষের দিকে তাকাল "পীযূষদা আমি একটু নামব"।
পীযূষ তার দিকে তাকিয়ে বলল "ওহ, এখন কোথাও যাবি? সাড়ে সাতটা বাজতে চলল, তোর কাছে ছাতা আছে তো? ভিজে যাবি তো"।
পিঙ্গল মাথা নাড়ল, পীযূষ গাড়িটা দাঁড় করিয়ে একটা ছাতা বের করল পিছনের সিট

থেকে “এই নে, এটা নিয়ে যা”।
সে কৃতজ্ঞ বোধ করছিল, এতটা অনেক বসই করবে না। ছাতাটার দরকার ছিল খুব। গাড়ি থেকে নেমে সে একটা ট্যাক্সি নিল। তনুশ্রীদের পাশের পাড়ার সিসিডিটা সে চেনে, একবার ওখানে দেখাও করেছে ওর সাথে। তার কৌতূহল বাড়ছিল ক্রমশ,বিয়ের ফাইল বন্ধ হবার পরে হঠাৎ করে কী এমন হল যে এভাবে দেখা করতে চাইছে মেয়েটা?
#
বৃষ্টিটা ভালই নেমেছে, তা সত্ত্বেও সিসিডিতে ভিড় আছে। একটা কোণার টেবিল ফাঁকা পেয়ে গেল তারা।এর আগে যতবার তারা দেখা করেছে, তনুশ্রী শাড়ি পরেছিল। এবার সালোয়ার কামিজ পরেছে।
তাকে দেখে হাসল তনুশ্রী, প্রত্যুত্তরে সেও হাসল, বসার পরে সে বলল “বলুন, কি বলার আছে?”
তনুশ্রী হাসিটা রেখেই বলল “আসলে ব্যাপারগুলি এমন হঠাৎ ভাবে হয়ে গেল, আমি বেশ চাপে পড়ে গিয়েছিলাম। সৌমেন আমার ফোন থেকে হঠাৎ ওই কথাগুলি বলল, বাড়ির লোকেরা দেখা করে বিয়েটা ক্যান্সেল করে দিল, আমি কিন্তু কিছুই বলতে পারলাম না। আমায় বেশ কিছুদিন ধরেই এই ব্যাপারটা ভাবাচ্ছে। আমি চাইছিলাম আপনাকে সবটা খুলে বলি”।
পিঙ্গলের বিরক্ত লাগছিল। অফিসে পীযূষদার ভাট, এতটা রাস্তা এসে যদি এখন তনুশ্রীরও এই সব প্যানপানানি শুনতে হয়…তার সেই মেয়েদের পাত্তা না দেওয়া অবতারে ফিরল সে। বলেই ফেলল সেটা “দেখুন,পোস্টমর্টেম জিনিসটা আমার একেবারেই পছন্দ নয়, আপনার একটা রিলেশন ছিল বা আছে, দ্যাটস ফাইন। আমি আর কিছু শুনতে চাইছি না, এসব ব্যাপারে আমি লিস্ট ইন্টারেস্টেড”।
তনুশ্রীর সপ্রতিভ মুখটা এবার ফ্যাকাশে হল তার কথা শুনে। সে মিইয়ে গেল গেল খানিকটা “এক্সট্রিমলি সরি, আমি আপনাকে এত কষ্ট করে আসতে বললাম, একটু ভুল হয়ে গেছে বোধহয়”।
পিঙ্গল নরম হল, বুঝল ডোজটা বেশি হয়ে গেছে, একটু হাসল। কথা ঘুরিয়ে বলল “খিদে পেয়েছে, চলুন কিছু খাওয়া যাক বরং”।
তনুশ্রী বলল “আচ্ছা, আমি শুধু একটা কফি”।
পিঙ্গল উঠে অর্ডার দিয়ে এল। তার মনে হচ্ছিল এখন তাকে কিছু ফালতু সময় কাটাতে হবে। সে বসলে তনুশ্রী বলল “ তারপরে আর কিছু প্রোগ্রেস হয়েছে?”
“কি ব্যাপারে?” বুঝল না সে।
“মানে বিয়ের ব্যাপারে… সরি একটু পার্সোনাল হয়ে গেল না প্রশ্নটা?”
“না না, ঠিক আছে”, সহজ হল সে, “না এখন ব্যাপারটা পোস্টপন করা হল, পরে দেখা যাবে”।
পিঙ্গল বুঝতে পারছিল তনুশ্রী কিছু বলার জন্য ছটফট করছে। কিন্তু সে নিজে থেকে কিছুই জানতে চাইল না। এই ব্যাপারে অহেতুক কৌতূহল দেখানোর কোন ইচ্ছাও কাজ করছিল না তার মধ্যে।
“আসলে বিয়েটা ভাঙার খবরে আমার বাবা একটু ভেঙে পড়েছে, অনেকটা কথা এগিয়েছিল তো”। তনুশ্রী আস্তে আস্তে বলল কথাটা।
তাদের কফি চলে এসেছিল। চিনি মেশাতে মেশাতে সে শুধু বলল “আচ্ছা”।
একটু বেগড়বাই দেখলে বরাবরই একটা খোলসে ঢুকে যেতে পছন্দ করে সে। এই মুহূর্তেও সেটাই করছিল সে।

তনুশ্রী বলল “দেখুন সৌমেনের সাথে আমার বন্ধুত্ব ছিল, ও সেটাকে রিলেশন বলে ভুল করে। আমি কিন্তু কোনদিন...”
পিঙ্গল থামাল তনুশ্রীকে, “আমাকে প্লিজ এসব বলবেন না। আপনি কি বিয়েটা নিয়ে আমাকে আবার ভাবতে বলছেন?”
তনুশ্রী কফিটায় চুমুক দিতে গিয়েও দিল না। কাপটা নামিয়ে রেখে বলল “হ্যাঁ, আমি সেটাই বলছি”।
পিঙ্গল কথাটা শুনে আর কিছু বলল না। চুপচাপ কফি খেতে লাগল।
তনুশ্রী পিঙ্গলের চুপচাপ হয়ে যাওয়া দেখে একটু অসহিষ্ণু হল “আমাকে কি হ্যাংলার মত শোনাচ্ছে?”
পিঙ্গল হাসল না। তনুশ্রীর চোখের দিকে তাকাল, বলল “এই পরিস্থিতিতে সেটাই স্বাভাবিক নয় কি?”
তনুশ্রী নিজের কাপের দিকে তাকাল। কয়েক সেকেন্ড এভাবেই কেটে গেল। তারপর বলল “হ্যাঁ, কিন্তু আমি আসলে এই বিয়েটায় আগ্রহী ছিলাম। ব্যাপারটা ভেস্তে যাওয়ায় আমি খানিকটা ভেঙে পড়েছি বলতে পারেন”।
পিঙ্গল বুঝতে পারছিল না কী বলবে। মেয়েটার সাথে একসময় তার বিয়ে ঠিক হয়েছিল, সে রাজিও ছিল এটা যেমন সত্যি, একই ভাবে এখন সে আর এই সম্পর্কটার ক্ষেত্রে একেবারেই কোন ইন্টারেস্ট পাচ্ছে না এটাও সত্যি। সারাদিন অফিসের পর তনুশ্রীর এই তলব এবং সরাসরি আবার সব কিছু কেঁচে গণ্ডূষ করার প্রস্তাবে তার মন ঠিক সায় দিচ্ছিল না।
সে তনুশ্রীর দিকে তাকিয়ে বলল “আপনি সব ভেবে চিন্তে কথাগুলি বলছেন তো? মানে হঠাৎ করে আবার যদি কোন এক্সটারনাল প্রব্লেম অ্যারাইজ করে...”
তনুশ্রীকে মরিয়া শোনাচ্ছিল “নইলে আমি কেন আপনাকে ডেকে আনব বলুন এতটা রাস্তা”।
বাইরে বৃষ্টিটা কমে আসছিল একেবারেই। পিঙ্গলের মনটা হঠাৎ বাড়ি বাড়ি করতে লাগল।

৮।
।।সে।।
অয়নদার একটা খুব গোপন কথা আছে। দিদি আমাকে বলেছিল ওর বিয়ের পরে। ফুলসজ্জার রাতে বলেছিল। একটা করে গোপন কথা বলার চুক্তি হয়েছিল নাকি ওদের মধ্যে। দিদি কি বলেছিল সেটা আমি জানি। পরে বলব। আর অয়নদা কী বলেছিল সেটা এখন বলব।
আমি কথাটা নিয়ে মাঝে মাঝে ভাবি। ভাবতে না চাইলেও কথাটা আমার মাথায় ঘুরপাক খায়। আর সেটা এক অদ্ভুত অস্বস্তির সৃষ্টি করে।
অয়নদার বাড়িতে অয়নদা ওর বাবা আর মা ছাড়াও এক মেয়ে কাজের লোক থাকত। এখনো থাকে। অয়নদার থেকে দু তিন বছরের বড়। ওদের মেয়ের মতোই ওর বাবা মা বড় করেছিল। অয়নদার বিয়ের দু বছর আগে বিয়েও দিয়েছিল তবে সে বিয়েটা টেকে নি। বিয়ে ভাঙার পর আবার ওদের বাড়িতে গিয়েই উঠেছিল।
অয়নদা নাকি একবার ওর বাবাকে সেই মেয়েটার সাথে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে ফেলেছিল। ওর মা বাজার গেছিলেন আর অয়নদা ঘুমাচ্ছিল। ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ করেই বাইরের ঘরে শব্দ পেয়ে গিয়ে বাবার সাথে সেই মেয়েটিকে ওই অবস্থায় দেখে। দেখে কিছুই করে নি। চুপচাপ আবার নিজের ঘরে এসে বসেছিল। সে সময় ও ক্লাস

নাইনে পড়ে।
আমার শুনে কেমন অবাক লেগেছিল। সে ঘোর কাটতে অনেক সময় লেগেছিল। অয়নদাদের ফ্যামিলি পাড়ার বেশ অভিজাত ফ্যামিলি। গাড়ি চালিয়ে অয়নদার বাবা অফিস যেতেন। বেশ ভাল রকম চাঁদা দিতেন পাড়ার পুজোয়। বেশ হাসিখুশি লোক ছিলেন। কিন্তু ঘটনাটা শোনার পর থেকে আমি ওনাকে দেখলে একটা অস্বস্তিতে পড়ে যেতাম। আমি কথাও বলতে পারতাম না ঠিক ঠাক। পালিয়ে বাঁচতাম ওনার সামনে থেকে।
আমার কেন জানিনা মনে হয় অয়নদার বাবার হার্ট অ্যাটাকের পেছনে এটা একটা কারণ। অয়নদা, দিদির ডিভোর্সটা বড় কারণ না। অয়নদা নিশ্চয়ই নেশার ঘোরে এটা বলে ফেলেছিল ঝগড়ার সময়। তারপরেই ভদ্রলোকের হার্ট অ্যাটাক হয়। অবশ্য এটা সত্যিই হয়েছিল কিনা আমি কনফার্ম না, আমার শুধু মনে হয় এটা।
এই কথাটা দিদি যদিও আমাকে বলেছিল কাউকে না বলতে কিন্তু আমি পারি নি। বলেই ফেলেছিলাম সেই ছেলেটাকে। অথচ এই ধরণের কথা যে আমি কোন অচেনা অজানা কাউকে বলতে পারি সেটা কোনদিন ভাবিই নি। কি ভেবে বলেছিলাম কে জানে। ছেলেটা শুনে অবাক হয় নি। অফিসের ব্যাগটা রেখে দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে বেঁধে রাখা নৌকা দেখতে দেখতে বলেছিল “এরকম হতে পারে। আসলে বয়সটা একটা বড় ফ্যাক্টর। মিডল এজে এলে অনেক যুক্তিবাদী লোক অযৌক্তিক কাজ করে ফেলতে পারে। নিজের বউকে তখন তো তার আর ভাল লাগে না। সকাল বিকেল রাত সেই একই মুখ দেখতে দেখতে লোকটা ক্লান্ত। ঘরের মধ্যে একটা কিশোরী মেয়ে, নতুন যৌবন আসছে, দেখে হয়ত ভদ্রলোক নিজেকে ধরে রাখতে পারেন নি”।
আমিও ছেলেটির কথাটা ফেলে দিতে পারি নি, তবে আমার মনে হয়েছিল অন্য কথা, “কিন্তু অয়নদা যেটা বলেছিল, সেটা অনুযায়ী ওই মেয়েটিও তো ওই ভদ্রলোকের প্রতি সমান পরিমাণ আকৃষ্ট হয়েছিল, এটা অস্বাভাবিক নয়? বরং মেয়েটির তো অয়নদার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত ছিল তাই নয় কি?”
ছেলেটা অনেকক্ষণ ভেবেছিল কথাটা নিয়ে। তারপর মাথা নেড়ে বলেছিল “নাহ, বরং এটাই স্বাভাবিক ছিল। মেয়েরা সাধারণত একটু বয়সে বড় লোক পছন্দ করে। এক্ষেত্রেও সেটাও ঘটেছে হয়ত”।
আমার মধ্যে আবার সেই প্রশ্নগুলি ভিড় করে আসছিল। আমার শুধু মনে হচ্ছিল অয়নদার মা কি এখনো জানেন ঘটনাটা? এত বড় একটা ঘটনা কি পুরোটাই তার অজান্তেই ঘটে চলেছিল।মেয়েটাকে নিজেদের মেয়ের মত করে বড় করে তুলেছিলেন তারা। যেখানে গেছেন সেখানে মেয়ে হিসেবেই পরিচয় দিতেন। এমনকি আমাদের বাড়িতেও তাই দিয়েছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ক। কিন্তু আসলে কি ভয়ংকর!
ছেলেটার সাথে সেদিন অনেকক্ষণ এই সব ভুল ভাল কথা বলে ফেলেছিলাম। মনে হয়েছিল নিজের আয়নার সামনে কথা বলছি। পুজো আমার দেওয়া হয় না। ছেলেটাও দেয় নি। বাস থেকে নেমে দুজনেই ঘাটের পাশের বসার জায়গায় গিয়ে বসে উল্টো পালটা বকেছিলাম। অনেকক্ষণ বক বক করে গেছিলাম। আমি বকে গেছি, ছেলেটা শুনে গেছিল। ছেলেটা বকে গেছে, আমি শুনে গেছিলাম। তার আগে কোন পরিচয়, কথাবার্তা কিছুই হয় নি। কিভাবে যে ছেলেটার সাথে অত কথা বললাম সেটা ভাবলে এখনো অবাক লাগে আমার। বেশ কিছুক্ষণ পরে কচুরি খেয়েছিলাম। ছেলেটাই টাকা দিয়েছিল, আমি দিতে যাই নি। কেন জানি না, ছেলেটা আমার খাবারের টাকা দিয়ে দেবে, আমার খুব একটা অস্বাভাবিক লাগে নি ব্যাপারটা।

সেদিন বাড়ি ফিরে বেশ হালকা হালকা লেগেছিল নিজেকে। আর তারপরে অনেকদিন বাস স্ট্যান্ডে যাই নি আমি। কেন জানি না, বার বার মনে হচ্ছিল গিয়ে যদি দেখি আসলে কেউ নেই, পুরোটাই আমার অবচেতন মনের সৃষ্টি! তাহলে কি হবে! বেশ কিছুদিন রুবির দিকটা অ্যাভয়েড করে গেছিলাম আমি। আর আশ্চর্যের কথা হল সেই ছেলেটার কোন ফোন নাম্বারও নিয়ে রাখা হয় নি আমার।

৯।
।।শোন কোন একদিন।।
ক.
- হাই
- নমস্কার
- নমস্কার
- কি হল বাংলায় ফিরলেন কেন?
- আপনি যে শুরুটা বাংলায় করলেন।
- ওহ। আমাকে আবার ভাষা আন্দোলনকারী ভাবলেন না তো?
- হা হা। না। সেরকম কিছু না,তবে একটু হোঁচট খেলাম শুরুতেই।
- এই রে। শুরুতেই ব্যাড ইম্প্রেশন?
- তা বলতে পারেন আবার নাও বলতে পারেন।
- আচ্ছা, আমরা একটু বসতে পারিতো?
- এহ দেখেছেন, দাঁড় করিয়ে রেখেছি আপনাকে। চলুন ভেতরে যাওয়া যাক। আসুন, এই রাস্তার ধারেই বসা যাক।
- আপনিও রাস্তার ধার প্রেফার করেন? আমিও করি।
- এটা এক্সট্রা অর্ডিনারি কিছু কি? শতকরা ৯৯ ভাগ মানুষই তাই করে।
- না না আমার বন্ধু অর্পিতা কিছুতেই রাস্তার কাছে বসবে না, ওর ধারনা ওখানে বসলেই রাস্তার সব লোক ওকে দেখতে দেখতে যাবে।
- আজিব কনসেপ্ট তো!
- তা বটে। তা কেন ডেকেছিলেন বললেন না তো। ভীষণ কষ্ট হয়েছে আজ ম্যানেজ করতে।
- বলছিলাম কি, এই অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ ব্যাপারটা আপনার একটু অড লাগে না?
- অ। তারমানে আপনার বিয়েটায় আপত্তি আছে ওই জন্য ডেকেছেন তো, এখন আমাকে বলবেন সরি ইত্যাদি।
- না না, আপনি একেবারেই ভুল ভাবছেন।
- তাহলে? বিয়ে করবেন?
- হ্যাঁ অবশ্যই করব। কিন্তু সমস্যা হল এইভাবে বিয়ে করে কি কোন থ্রিল আছে বলুন তো?
- মানে?
- মানে হল আমরা তো আর প্রেম করে বিয়ে করছি না। বাড়ির অমতে। সবাই জানে, সবাই ঠিক করে দিয়েছে তারপর আমাদের বিয়ে হয়েছে। ওদিকে আমার এক বন্ধু বিয়ে করেছে বাড়ির অমতে। মেয়ের বাবা আবার বিরাট নেতা। যত রকমভাবে পারে হেনস্থা হচ্ছে। কিন্তু দেখুন, এতে কত থ্রিল। ওদের মধ্যে ভালবাসা টইটম্বুর যাকে বলে।

মেয়ে একেবারে বাপের বিরুদ্ধেই দাঁড়িয়ে গেছে বলতে গেলে। বাপের পোষা গুন্ডা গুলোকে ও তো ভালকরেই চেনে।
- কোথায় হচ্ছে এসব? বাংলা সিনেমা ছাড়া এসব হয় আজকাল?
- হয় হয় কেন হবে না? আপনি কি ভাবছেন আমি ঢপ মারছি?
- না না। সেটা না কিন্তু কেমন অবিশ্বাস্য লাগছে।
- এরকম মনে করার কোন কারণ নেই। তারপর শুনুন, মেয়ের বাবাকে শেষ পর্যন্ত হার মানতেই হল। তার আগে অবধি ওরা একবার গুন্ডার হাত থেকে বাঁচতে নেপাল পর্যন্ত পালিয়ে গেছিল।
- সেকি?
- আঁতকে উঠবেন না। বরং রোমাঞ্চিত হোন। কী রোম্যান্স বলুন তো?
- আমি কোল্ড কফি খাব না।
- হ্যাঁ। ও আচ্ছা, দেখছি। চাখাবেন তাহলে?
- না হট কফি।
- ওকে। তা যেটা বলছিলাম। কী থ্রিল দেখলেন?
- শুনুন, আমি যে এই আপনার সাথে দেখা করতে এসছি কফি শপে বিয়ের আগে, এটা আমার বাবা জানলেও কিন্তু থ্রিল কম হবে না। মাকে বলে দেব বাবাকে বলতে?
- এই মরেছে। আমি কি সেটা বললাম নাকি! আরে দাঁড়ান দাঁড়ান। আপনি আমার পয়েন্টটা ধরতে পারছেন না কিন্তু।
- খুব পারছি। আপনি কি চাইছেন প্রেম করে বিয়ে করতে তো? তা করুন না। আমি নেই।
- আরে রাগ করছেন কেন, আমি চাইছি এরকম লুকিয়ে দেখা করি, সিনেমায় যাই এইসব আর কি।
- ও বাবা। মানে আমি আমার বাবাকে লুকিয়ে এভাবে আসব, তারপর সিনেমায় যাব, মানে আমি যত হ্যাপা পোহাব?
- ইয়ে মানে আনফরচুনেটলি সেটাই দাঁড়াচ্ছে।
- দেখুন মশাই। আমি এত ঝামেলা পারলাম না। আপনার বিয়ে করতে হলে করুন না হলে ছাড়ুন।
- এই দেখুন, আমি কি কথাটা সেভাবে বললাম নাকি?
- যেভাবেই বলুন মোদ্দা কথাটা এটাই দাঁড়ায়।
- আচ্ছা আপনার বাবা এরকম অমরেশ পুরীর মত ভিলেন কেন বলুন তো?
- মানে?
- মানে আর কী। বাবা দুইরকম হয়।একরকম কাদের খানের মত। আরেকরকম অমরেশ পুরীর মত। আমি বেঁচে গেছি আমার বাবা কাদের খানের মত হওয়ায়। কিন্তু আপনার বাবা তো পুরো অমরেশ পুরী। বাপরে, পাকা কথার দিন এমনভাবে তাকাচ্ছিলেন যেন আমি সারদার টাকা মেরে দিয়েছি।
- আপনি আমার বাবাকে অপমান করছেন না তো?
- না না, ছি ছি, এ আবার কী কথা। আমি কী সেটা বললাম নাকি।
- আবার কী বলছেন। আমার বাবা স্কুলের হেডমাস্টার হলেন মানে কি খুব কড়া হলেন? তা কিন্তু না। তবে উনি কিছু গাইডলাইন মেনে চলতে বলেন আমাদের,আমরা শুধু সেটা মেনে চলি। এবং মানা দরকার এটাও মন থেকে বিশ্বাস করি।
- দেখেছেন, আমি কিন্তু কথাটা সেভাবে বলি নি।
- আর কিভাবে বলেছেন, আচ্ছা ছাড়ুন। আপনি যে এই রোম্যান্স টোম্যান্স খুঁজছেন,

তা এই বিক্ষুব্ধ সময়ে দাঁড়িয়ে হঠাৎ এরকম রোম্যান্স আসে কোত্থেকে আপনার বলুন তো?
- এই সেরেছে। আবার বিক্ষুব্ধ সময় টময় কী সব বলছেন। আপনি মাওবাদী না ঋত্বিক ঘটক?
- অতটাও না। কিন্তু আপনি কাগজটাগজ পড়েন তো? নিউজ দেখেন? এই কালকেও একটা মেয়েকে রেপ করে ঝুলিয়ে দিয়েছে পাড়ার মোড়ে। এই সময়ে দাঁড়িয়ে আপনি উত্তমকুমারের মত ছদ্মবেশী ছদ্মবেশী খেলবেন এটা একটুবেশি হয়ে গেল না?
- এক্সট্রিমলি সরি কিন্তু এখানে আমার কী করার আছে বলতে পারবেন? মুখ হাড়ি করে বসে অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ করব?চিনি না জানি না এমন একটা মেয়েকে বিয়ে করব!
- করবেন না! আপনাকে কেউ মাথার দিব্যি দিয়েছে কি যে এই মেয়েটা উদ্ধার হচ্ছে না, এসে উদ্ধার করে দিয়ে যান। তাছাড়া আপনাদের বাড়ি থেকে সম্বন্ধটা এসেছে, আমার কোন ইচ্ছা ছিল না এম এস সিটা কমপ্লিট নাকরে বিয়ে করার। আপনার জন্য সেটাও করতে হয়েছে। আর তিন মাস পরে আমাদের বিয়ে আর আপনি এই সব বলছেন। এটা তো আগে মনে হওয়া উচিত ছিল।
- না আসলে দেখুন আমি আপনাকে একটা প্রস্তাব দিয়েছি মাত্র। এবার সেটাকে মানা না মানা আপনার ব্যাপার।
- ও তাই। ঠিক আছে।
- আচ্ছা আপনার কি মনে হয় না আপনি একটু বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে পড়ছেন? সেদিন মেট্রোতে আপনাকে দেখে বিশ্বাস করুন আমার মাথা পুরো শাট ডাউন হয়ে গিয়েছিল। যখন জানলাম আপনি পাশের পাড়াতেই থাকেন তখন বাবা মাকে জানালাম। আমি তো নিজে থেকেও যেতে পারতাম কথা বলতে তাই না?
- হ্যাঁ, সেটা করলেই পারতেন। কেন করলেন না?
- রাস্তাঘাটে একটা মেয়েকে দাঁড় করিয়ে কথা বলানোটা ঠিক ভদ্রতার পর্যায়ে পড়ে না আর কি।
- তা এখন এই লুকিয়ে দেখা করাটাই বা কী এমন ভদ্রতার শ্রেণীভুক্ত হল শুনি।
- ওহ, আপনার সাথে কথা বলাটাই দায় হয়ে উঠছে দেখছি।
- ঠিক আছে। আপনার প্রস্তাব আমি ভেবে দেখব, তবে কথা দিতে পারলাম না।
- তাহলেই হবে। আইসক্রিম খাবেন?
- না, আমার গলা ব্যাথা।
- আপনি কিন্তু বেশ ভাল গান
- থ্যাঙ্কস।
- প্রফেশনালি গান গাইতে পারেন।
- তাই?
- হ্যাঁ, আমি সিরিয়াস।
- তাহলে বিয়ের পর টাকা দেবেন। অ্যালবাম বের করব।
- আচ্ছা আপনি কি বরাবরই এত তিতে?
- মানে?
- মানে এই যে এত রিঅ্যাকশান দেন সব কিছুতে?
- না দিই না। আপনার প্রস্তাবটা শুনে মাথা গরম হয়ে গেছিল এখন ঠিক হচ্ছে খানিকটা। দয়া করে নতুন কোন ভুলভাল প্রপোজাল দেবেন না আশা করব।
- না না, ছি ছি, আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন।

- আপনি আমার সমস্যাটা না বুঝে কথা বললে আমার ভুল বোঝাটাও সেই প্যাকেজের মধ্যে চলে আসে তাই না?
- আমি এক্সট্রিমলি সরি। এই নিয়ে আর কিছু বলব না।
- হুম। আর মেয়ের বাবাকে ভয় পাওয়াটা কোন কাজের কথা না। চাউনি যাই হোক বাবা কি আপনাকে গুলি করতে যাচ্ছে?
- আমার আসলে হেড স্যারদের খুব ভয়, দেখলে মনে হয় কান ধরিয়ে ঘরের বাইরে নীল ডাউন করিয়ে রাখবে।
- কেন, আপনি তো খুব ভাল ছাত্র ছিলেন, তাহলে এরকম অদ্ভুত ভয় কেন?
- আমি চিরকালই একটু ভীতু। টিচার, প্রফেসারদের দেখলেই মনে হয় এই হয়ত উনত্রিশের ঘরের নামতা জিজ্ঞেস করে বসবে।
- হা হা।
- বাহ, হাসলে আপনাকে বেশ সুন্দর দেখায় তো। আরেকটু হাসুন না।
- মানে? আরেকটু হাসব? কোন কারণ ছাড়াই?
- কারণ ছাড়া হাসা যায় না?
- হাসা যায়? আপনি কারণ ছাড়াই হাসেন?
- কেন লাফিং ক্লাবের মেম্বাররা তো কারণ ছাড়াই হাসেন।
- কে বলল কারণ ছাড়া হাসেন? ওনাদের হাসিরও কারণ আছে। শরীর সারানো।
- আপনার সাথে কথায় পারব না।
- চলুন এবার বেরনো যাক। আমার হাতে আর বেশি সময় নেই।
- সেকি? আর কিছু খাবেন না?
- না
- ঠিক আছে, অগত্যা...

খ.
- হ্যালো
- নমস্কার
- সে কি? এবার আপনি বাংলায় ফিরলেন?
- হ্যাঁ মানে আপনার থেকেই ইন্সপিরেশন নিলাম।
- বাহ। তাহলে আপনাকে ফোন করে নমস্কার বলেই কথা শুরু করব এরপর থেকে।
- নিশ্চয়ই। আপনি ঠিক ঠাক পৌঁছেছেন তো?
- হ্যাঁ। তা পৌঁছেছি। তবে রাস্তায় যখন ছিলাম একটা কথা ভাবছিলাম।
- কি বলুন তো?
- এই যে আপনি থ্রিল চাইছেন,সেটার একটা ব্যবস্থা হতে পারে।
- বেশ তো বলুন
- বাবা আজ বাড়িতে চলে এসছেন তাড়াতাড়ি। আপনি এক কাজ করুন আমাদের বাড়ি চলে আসুন। বাবাকে বলুন আমাকে নিয়ে কালকে একটু শপিংয়ে যাবেন।
- ওরে বাবা। আচ্ছা আপনার কি আমাকে পছন্দ না?
- কেন বলুন তো?
- নইলে আপনি আমাকে এরকম বাঘের মুখে ফেলে দেবার কথা বলছেন কেন?
- আমি কিন্তু আপনার থ্রিলের কথা ভেবেই প্রস্তাবটা রাখলাম। আপনি আজ আসুন। তাহলে আবার কালকে আমি যাব। ভাল হয় না?
- না না। কোন দরকার নেই আমার থ্রিলের। আমি এখনই ভাল আছি।

- যাহ্। তাহলে আর কি করার।ঠিক আছে। তাহলে রাখি?
- হ্যাঁ ঠিক আছে। তবে আমরা কি এবার তুমি তে নামতে পারি?
- উমমমম... ঠিক আছে, নো প্রবলেম
- মেনি থ্যাঙ্কস। রাখছি তাহলে?
- হ্যাঁ; রাখ।

।।উপমন্যু।।

আমার জীবনে এত মেয়ে যাওয়া আসা করল, তবু এই মেয়েটাকে আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না। আসলে কোন মেয়েকেই আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। এই তানিয়াদি এপিসোডের পরে আমি দেখেছি আমার ভেতরে একটা অন্যরকম চেঞ্জ হয়ে গেছিল এবং সেটা অবশ্যই আমার ভার্জিনিটির বারোটা বাজার পরে। একটা অদ্ভুত নেশা এটা। বহু কষ্টে তানিয়াদির ঐ ফ্ল্যাটে যাওয়া আমার বন্ধ হয়েছিল কিন্তু মাঝে মাঝে ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেলে হঠাৎ করে মনে হত তানিয়াদির ফ্ল্যাটে চলে যাই। গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি আবার ওর ওপরে। আমার এক বন্ধু কর্ণ এক সময় প্রচুর ব্রাউন সুগার নিত। ওটা ছাড়াবার সময় ওকে যেভাবে ছটফট করতে দেখেছি, আমার মনে হয় আমার কষ্টটা এর থেকে কোন অংশেই কম ছিল না।
এবং...
হ্যাঁ এবং...
সম্প্রীতিকে দেখার পর এবং গোটা ব্যাপারটা বাড়িতে জানানোর পর আবার আমি ট্র্যাকে ফিরে এসছি। পিঙ্গলকে নিয়ে সবাই চাপে ভুগছিল। আমি ভেবেছিলাম আমার কেসটা শুনলে হয়ত চাপটা কমে যাবে ওদের। আমি ওদের আশ্বস্ত করার জন্যই বললাম মেয়েটাকে ভাল লাগার কথা।
উল্টে আরও চাপ হয়ে গেল।
ঘটনাটা বলে নি আগে। অফিস থেকে ফিরলাম। যাহ, আমার চাকরি পাবার গল্পটাও স্কিপ করে গেছি। আচ্ছা সে সব পরে বলা যাবে, চাকরি পাওয়ার গল্পটল্প বলে লাভ নেই। যেটা বললে লাভ সেটা আগে বলে নি।
অফিসে আমার একমাস হয়েছে। ফার্স্ট হাফে কড়া ট্রেনিং থাকে। তিনটে অবধি ঐ ইয়ে ফাটানো ট্রেনিং সেশনটার পর দু আড়াই ঘণ্টা কম্পিউটারের সামনে বেশ খানিকটা প্র্যাক্টিস করে বেরিয়ে যাই। কোনদিন সিনেমা,কোনদিন নাটক এইসব করে ভালই চলছিল। আর এমন কপাল, সম্প্রীতির মত একটি বিশ্বকাঁপানো সুন্দরী যে আমাদের পাড়ায় থাকে আমি জানতাম না। অবশ্য জানবার কথাও না। সেই কবি বলেছে আমরা ঘরের পাশের শিশির বিন্দু নাকি দেখেও দেখি না, আমি একেবারেই তাই। একদিন মেট্রোতে দেখলাম। তখনই মাথা ফাথা ঘুরে গেছিল। তারপর মেট্রো থেকে নেমে দেখি আমার সাথে এক অটোতেই উঠল। এক স্টপেজেই নামল। তারপর দেখি পাড়ার হেডু প্রশান্ত বসুর বাড়ি ঢুকে গেল। পরের দিন পাড়ার একটা বন্ধুর থেকে খবর নিয়ে অবাক হলাম যে এ ঐ হেডুরই মেয়ে। লোকে ঠিকই বলে কলকাতার পাবলিক নিজের পাড়ার লোকের খবর রাখে না।
সারাদিন অফিসে ভেবে টেবে, অফিস থেকে ফিরে জামা কাপড় ছেড়ে টিভির ঘরে গিয়ে দেখি বাবা মা নিবিষ্ট মনে সিরিয়াল দেখছে। আমি চুপচাপ ভদ্রছেলের মত তাদের পাশে বসলাম। মা আমাকে দেখে অবাকই হল,কারণ ঐ সিরিয়াল চলার টাইমটা আমি টিভির ত্রিসীমানায় থাকি না। মা টিভিটা মিউট করে বলল “কিরে কিছু

বলবি?”
আমি গম্ভীর হয়ে বললাম “তোমরা পিঙ্গলকে নিয়ে খুব চাপে আছ না?”
মা অবাক হয়ে বলল “হ্যাঁ, সে তো আছিই। শুনছি ঐ মেয়েটা নাকি পিঙ্গলকে মিট করেছিল, বলেছে ওর মত আছে এখনো। এবার পিঙ্গল কী বলে সেটাই দেখার। এই নিয়েই তো চলছে এখন। কোন নতুন খবর পেলি নাকি?”
আমি গম্ভীর ভাবটা বজায় রেখে বললাম “না ঐ ব্যাপারে না। তবে আমি বলতে এলাম যে পিঙ্গলকে নিয়ে চাপ নিও না। এবার বরং আমার ব্যাপারে চাপ নাও। আমার একটা মেয়েকে পছন্দ হয়েছে”।
বাবা মাকে বলল “বোঝ। একমাসও হয়নি চাকরির এর মধ্যে পছন্দ করে ফেলেছে”। এরপর আমার দিকে ফিরল “প্রেম করছিস?”
আমি জোরে জোরে মাথা নাড়ালাম “না না, কালই দেখলাম। এই তো, পাড়ার মেয়ে। প্রশান্ত বসুর মেয়ে। আমার পছন্দ হয়েছে। তোমরা বিয়ের ব্যাপারে কথা বল”।
বাবা মা দুজনেই বড় বড় চোখ করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক সেকেন্ড। তারপর বাবা বলল “সে কি রে। একদিন দেখলি। পছন্দ হয়ে গেল?”
মা বাবার দিকে ফিরল “মেয়েটাকে আমি দেখেছি, এনার পছন্দ আছে বলতে হবে। তবে শুধু দেখলে হবে কি? আজকালকার দিনের মেয়ে। প্রেম ট্রেম আছে নাকি দেখতে হবে।আর এত কম বয়সে ছেলের বিয়ে দেবে নাকি?”
বাবা হাসল “তুমি বিয়ে পর্যন্ত যাচ্ছ কেন? দাঁড়াও আগে দেখি। কাল একবার প্রশান্তবাবুর সাথে কথা বলি। রাশভারী লোক, বাজারে দেখা হলে আমারই কেমন ভয় ভয় লাগে কথা বলতে”।
মা কেমন কিন্তু কিন্তু করতে লাগল “কিন্তু ঘটনা হল, ছেলের শ্বশুরবাড়ি পাড়ায় হওয়াটা ভাল?”
বাবা আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল “ওসব নিয়ে ভেবে লাভ নেই। একদিকে ভালই হয়েছে। ভাল ফ্যামিলি। ভাল শিক্ষা দীক্ষা পেয়েছে। এই বাদরটাও শাসনে থাকবে”।

আমি হালকা প্রতিবাদ করে চেপে গেছিলাম। পরিস্থিতি অনুকূল চন্দ্র হলে বামা ক্ষ্যাপাকে টানাটানি করার দরকার পড়ে না।

প্রাথমিক কথাবার্তার পর ও বাড়ি থেকে সবুজ সংকেত এল, কিন্তু একটা শর্ত সমেত। হেডু আমার সাথে একবার আলাদা কথা বলতে চায়। শুনে তো আমার অবস্থা খারাপ। এক বৃহস্পতিবার কথা হয়েছিল। দেখা করার কথা রোববার। আমার ওই তিনদিন ব্যাপক টেনশনে কাটল। রাতে ঘুম হয় না, দিনে অফিসের ট্রেনিংয়ে কি পড়াল কিচ্ছুটি মাথায় ঢুকল না, কোনমতে শুক্রবারের ক্লাসটেস্টে টায়ে টায়ে পাশ করলাম। কথা ছিল ওদের বাড়িতেই সকাল ন'টার সময় ব্রেকফাস্ট হবে। শনিবার রাতটা ঘুমাতে পারলাম না। শেষরাতের দিকে ঘুম এল। আটটায় মার ডাকে ধরমরিয়ে উঠে দৌড়লাম ওদের বাড়ি। পৌনে ন'টাতে যখন কলিং বেল বাজালাম তখন দরজা যিনি খুললেন তাকে দেখে হার্টবিট মিস হল আমার।
আমি পরে চিন্তা করে দেখেছি এই হার্টবিট মিসটা আমার কাউকে প্রথম মিট করার পরে হবেই। এটা নতুন কিছু না। আসলে ওটা সম্প্রীতিকে দেখার জন্য হল নাকি দরজা খোলার জন্য হল ঠিক বুঝতে পারলাম না।
একটা ব্যাপার হল এর আগে দেবোপমার বাবা আমাকে যেভাবে থ্রেট করেছিল, সেই

ব্যাপারটা এ'কদিন আমার মাথায় বেশ পাক খেয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল হেডু হয়ত আমাকে পাতি ঝাড় দিতেই ডেকে পাঠিয়েছে।
মেয়ে অবশ্য আমায় বেশিক্ষণ দেখে নি। দরজা খুলে "আপনি ভেতরে এসে বসুন" বলে ওদের ড্রয়িংরুমে বসিয়ে কেটে পড়ল। আমার হার্টবিটের আওয়াজ আমি নিজে শুনতে পাচ্ছিলাম আর পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম কদিন আগে দেওয়া ইন্টারভিউয়ের টেনশন আজকের টেনশনের কাছে নস্যি।
হেডু রাশভারী লোক। পাড়ায় যারা চাঁদা চাইতে আসে তাদের উনি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব কিংবা প্রজ্ঞাপারমিতা বানান ধরেন না যদিও, তবে তারা এনাকে সমঝেই চলে। ব্ল্যাঙ্ক রসিদ কাটা হয় সাধারণত। আমি এ বাড়িতে আসার আগে যে হোমওয়ার্ক করেছিলাম, তাতে এটা ছাড়া খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় নি। এই মেয়ে যাদবপুরে কেমিস্ট্রি অনার্স থার্ড ইয়ারে পড়ছে এখন, ওখানের রিপোর্টটা পাওয়া যাবে আরও দু তিন দিন পরে, এক বন্ধু দেখবে বলেছে। প্রেম থাকলে আমি ঠিক করে নিয়েছিলাম বেশি চাপ আর নেব না। বয়ফ্রেন্ডওয়ালা মেয়ের পেছনে লেবার দেওয়া লেবার পেনের থেকেও বেশি ব্যথা দেয়।পরে অবশ্য জানা গেছিল বেশ কিছু গ্যাঙের সাথে গ্যাঙর গ্যাং থাকলেও সেরকম কোন ছেলে পাওয়া যায় নি যার সাথে লেকের ধারে কিংবা ক্লাস কেটে ইয়ে টিয়ে হবে। তবে আমি ঠিক করে নিয়েছিলাম যে যাই বলুক একবার জিজ্ঞেস করে নেওয়া যাবে।
"গুড মর্নিং, তুমি ভাল তো?"
কথাটা বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন হেডু। আমার চাপে চোদ্দপুরুষ উদ্ধার হবার অবস্থা। সোফা থেকে উঠে কোনমতে চিঁচিঁ করে উত্তর দিলাম "গুড মর্নিং, হ্যাঁ ভাল আছি। আপনি ভাল তো"।
"বোস বোস", হাত নেড়ে আমাকে বসতে বললেন। আমি বসতে বললেন "তোমার চাকরির এক মাস মত হয়েছে না?"
আমি "হ্যাঁ" বললাম।
"বেশ। আমার চাকরির আর বেশি বাকি নেই। তিন বছর মত। হয়ে এল প্রায়"।
এ কথার কি উত্তর দেওয়া যায়! চুপচাপ শুনলাম।
"আচ্ছা তুমি তোমার নামের মানে জান?" একটু অন্য ট্র্যাকে খেললেন।
আমি এই প্রশ্নটা কমন পেলাম। উপমন্যু নামটা বাপে রেখেছে আর আমার সবাইকে মানে বলতে বলতে মুখস্থ হয়ে গেছে। বলে ফেললাম হড়বড় করে,
"আয়োদ ধৌম্যর এক শিষ্য যিনি গুরুর আদেশে গরু ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। খাওয়ার ব্যাপারে গুরুর নানান নিষেধাজ্ঞা থাকায় উপমন্যু একদিন ক্ষুধার্ত হয়ে আকন্দপাতা খেয়ে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। পরে গুরুর নির্দেশে দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব করে উনি আবার দৃষ্টি ফিরে পান। "
আমার উত্তরে হেডু হাসলেন "সেটা তো গেল উপমন্যু কে ছিলেন? মানেটা জান কী তোমার নামের?"
আমি একটু চাপে পড়লেও গেস মারলাম একটা "অনুগত শিষ্য"।
হেডু খুশি হলেন খানিকটা "বাহ। ঠিক। তুমি মহাভারত পড়েছ?"
আমার রীতিমত ইয়ে জ্বলছিল। এসছি তোর মেয়েকে বিয়ে করতে, ভাবটা এমন যেন আই এ এসের ইন্টারভিউ হচ্ছে। তবু দাঁত ক্যালাতে ভুললাম না। ভাল ছেলের মত বললাম "হ্যাঁ। পড়েছি"।
"ভাল। আচ্ছা তুমি মামণিকে দেখে বাড়িতে বলেছিলে তোমার ওকে পছন্দ?"
মহাভারত থেকে মেট্রোতে এই বিষয় পরিবর্তনে আমি একটু চমকালাম। তবে মিথ্যা

বললাম না, বলে ফেললাম "হ্যাঁ"।
সম্প্রীতি আর ওর মা ঘরে ঢুকল। দুজনের হাতে বেশ লোভনীয় লুচি, মিষ্টি ইত্যাদি। সামনের টেবিলে ওগুলো নামিয়ে দিয়ে সম্প্রীতি আবার কেটে পড়ল। তবে ওর মা বসলেন স্বামীর পাশে।
হবু শ্বশুর প্লেটের দিকে দেখিয়ে বললেন "চল শুরু করা যাক, খেতে খেতে কথা বলা যাবে"।
আমি বাড়িতে লুচি খাই এক গ্রাসে একটা। এখানে একটা লুচির দশভাগের একভাগ একটু একটু করে ছিঁড়ে খেতে লাগলাম।
লুচিটা মুখে দেবার পর সম্প্রীতির মা বললেন "তোমার তো শনি রবি ছুটি তাই না?"
আমি মাথা নাড়লাম। বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ। বাড়িতে মা বাপ মেয়ে ছাড়া কেউ থাকে না। আজকেও অহেতুক আত্মীয়স্বজন ডেকে আনা হয় নি ছেলে দেখাবার নাম করে। তবু আমি সহজ হতে পারছিলাম না।
"তোমার বাবার কাছে শুনলাম তোমরা চট্টগ্রামের লোক। আমরা ঢাকার। এই তথ্যগুলি তুমি জান?"
আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না হেড়ুর উদ্দেশ্যটা কি। একটা প্রশ্নের সাথেও একটা প্রশ্নের মিল খুঁজে পাচ্ছিলাম না।
বললাম "হ্যাঁ জানি আমাদের বাড়িরটা। এই বাড়িরটা জানতাম না"।
"আমরা আসলে কিছুদিন আগে গেছিলাম ওখানে। বেশ ভাল লাগল। নিজেদের বাড়িঘর"।
অ। এগুলি ফাউ পীরিত আর কী। আমি আবার চাপ কম নিলাম। হাত আর মুখ চালাতে লাগলাম।
"আমার একটা ইচ্ছা আছে। বিয়ের আগে তোমরা ফোনে কথা বলতে পার। কিন্তু দেখা সাক্ষাৎ একটু কম হওয়াই ভাল। আর যদি হয়ও, সেটা আমাদের বাড়িতে হলেই ভাল"।
আমার ইন্টারভিউয়ের এক্সপেরিয়েন্স বলে, ইন্টারভিউয়ার যখন এক্সপেক্টেড স্যালারি জিজ্ঞেস করে তখন চাকরি মোটামুটি পাকা ধরে নেওয়া যায়। এই তিনচারটে প্রশ্নর পরে হেড়ুর এই কথার মানে আমি বেরতে পেরেছি সম্ভবত। অত বোঝাবুঝির কিছু নেই, মা বলেছিল, যা বলবে হ্যাঁ করে যাবি না একটু ভেবে টেবে বলবি, কিন্তু আমি কিছু না ভেবেই বললাম "ঠিক আছে"।
হেড়ু মেয়েকে ডাকলেন। মেয়ে দেখলাম দিব্যি, জড়তাহীন। চুপচাপ এসে বাবার পাশে বসল। অবশ্য আমার হার্টবিট বাড়তে থাকলেও আমি এমন একটা ভাব করছিলাম যেন আমি ওসব কিছু দেখছি না।

১০।

।।সে আর ও।।
সে- গঙ্গা যে এত কাছে আছে কলকাতার মাঝে মাঝে ভুলে যাই।

ও- আমিও। আমার মনে হয় যে লোকগুলি ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করে কলকাতায় চাকরি করতে এসে খেয়া পারাপার করে কিংবা হাওড়া ব্রিজ ক্রস করে, তারাও ভুলে যায়।

সে- সবাই কী?

ও-মোর দ্যান ৬০% তো বটেই।

সে- হ্যাঁ এটা হতে পারে।

ও- আর সবাই ধার্মিক

সে- সে তো আমিও।

ও- তাই?

সে- হ্যাঁ। নইলে সকালে না খেয়ে মন্দিরে যেতাম?

ও- তাই তো।

সে- আপনি?

ও- আমি ঠিক জানি না। ওই মাঝামাঝি কিছু একটা হবে। পরীক্ষার আগে আর রেজাল্টের সময়,অফিসের প্রোমোশনের সময় খুব ধার্মিক, বাকি সময়টা কম ধার্মিক।

সে- এই পারসেন্টেজ টাই তো বেশি এখন।

ও- হ্যাঁ সেটা হতে পারে। ধর্ম কর্ম করা কি খুব বিরাট অ্যাচিভমেন্টের ব্যাপার?

সে- না না, সেরকম বলি নি। তবে মাঝে মাঝে যখন কিছু ভাল লাগে না, তখন ঠাকুরঘরে চুপচাপ বসতে খারাপ লাগে না।

ও- আমার মন খারাপ করার সময় থাকে না অফিসের চাপে।
সে- আচ্ছা এই যে আপনি অফিস বাঙ্ক মেরে চলে এলেন, এই নিয়ে সেকেন্ড দিন। এই নিয়ে সমস্যা হবে না?

ও- এই যে আপনি আমাকে অ্যাভয়েড করতে গিয়েও করতে পারছেন না, বাস স্ট্যান্ডে প্রায় এক মাস পরে এলেন, সমস্যা হল না?

সে- হয়েছিল তো। বেশ সমস্যা হচ্ছিল। কিন্তু কিছু করার ছিল না। আপনার কি কোন সমস্যা হয়েছিল এই এক মাস?

ও- এই যে অফিস করছিলাম,বিরক্ত লাগছিল। রোজই ভাবি আপনাকে দেখতে পাব, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না, এই ব্যাপারটা বেশ সমস্যা তৈরি করছিল। আর অফিস না গেলে সমস্যা তো হবেই, প্রচুর কাজ বাকি আছে আমাদের প্রোজেক্টের। কিন্তু এই ব্রেকটা না নিলে অফিসটা বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়াত। আর ইদানীং আমার মনে হয় অফিস টফিস ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা করি। বাঙালির ছেলের চাকরি না পেলে জীবন শেষ হয়ে যায়, আর গুজরাটিরা আই আই এম থেকে বেরিয়ে ব্যবসায় নামে।

সে- কিন্তু বাঙালির তো ক্যাপিটালের অভাব তাই না? ব্যবসা করতে গেলে তো কিছু পকেটে নিয়ে নামতে হবে।

ও- শুরু থেকেই আমার কিছু নেই মেন্টালিটি নিয়ে নামলে এই রকম অনেক অজুহাত খাড়া করা যাবে।

সে- তাহলে অয়নদারও কি মেন্টালিটির সমস্যা ছিল? ট্রেনিং পিরিয়ডে চাকরি চলে যাবার পর একেবারেই কেমন যেন হয়ে গেল। একটা সংসার একেবারে বানের জলেই ভেসে গেল বলতে গেলে।

ও- আমি তো অয়নদাকে চিনি না। কিন্তু এটা বাঙালি বলে হয়েছে মনে হয় না। একটা নতুন রিলেশনের শুরুতে হঠাৎ করে চাকরি চলে যাওয়া, তার সাথে বাড়িতে দিনের পর দিন একটা সমস্যা জেনেও সেটা নিয়ে গুমরে গুমরে থাকা, এগুলি সব একসাথে এফেক্ট করেছে তার ওপর।অ্যাটলিস্ট আমার এটাই মনে হয়।

সে- জানি না। আমার আজকাল বাড়িতে যেতেই ইচ্ছা করে না। সবসময় গুমোট হয়ে থাকে, মনে হয় গেলেই আগুন লেগে যাবে যখন তখন।

ও -সেতো আমারও একই ব্যাপার। বিয়ে বিয়ে বিয়ে। বিয়ে না করলে যেন বাঙালি পুরুষের স্বর্গলাভ হবে না। বিয়ে কর, বাচ্চা পয়দা কর, বাচ্চাকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াও, বউ বাচ্চা নিয়ে বছরে একবার বেড়াতে যাও, ব্যস। তুমি সেটলড।

সে- এছাড়া কি করার আছে? কোন বিকল্পও তো নেই।

ও- কেন নেই?

সে- আপনি তো ছেলে। বিয়ে না করলে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু মেয়ে হলে তো বিয়ে করাটাই নিয়তি।মেয়ে জন্মালে বাবার মাথায় চিন্তা আসে মেয়ের বিয়ের জন্য টাকা জমাতে হবে। মেয়ে জন্মালে বাবারা তখন থেকে আলাদা প্ল্যানিং করে ফেলে। আমার দিদির তো এত তিক্ত অভিজ্ঞতার পর বাড়িতে বসে থাকলে সব থেকে ভাল হত। সেটা কি হচ্ছে? গুষ্টিশুদ্ধ সব লোক নেমে পড়েছে দিদিকে উদ্ধার করতে। যে কাকার নামও শুনিনি সেও সম্বন্ধ আনছে। যে মামাকে সারাজীবন চোখেও দেখিনি, দিদিকে দেখে সে চোখের জলে একাকার হয়ে যাচ্ছে। এটা তো না করলে ভাল হত। এতে তো আমরা অনেক বেশি এমব্যারাস হই, সেটা এরা হয় বোঝে না বা বোঝার চেষ্টা করে না। এদিকে সেদিন একটা সম্বন্ধ এসেছিল আসানসোল থেকে। পাড়ার কে নাকি ওদের দিদির সম্পর্কে উল্টোপালটা বলে দিয়েছে। দিদি নাকি নষ্ট মেয়ে ইত্যাদি। যা বর্ণনা শুনলাম, মনে হল অয়নদাই।

ও- ওহ, এটাতো জানতাম না।

সে-এটা বলতাম। কথায় কথায় বেরিয়ে এল।

ও- তার মানে তো অয়নদা আপনার দিদিকে ভালই বাসেন।

সে- ভাল বাসে বা অভ্যাস। আগে যেরকম বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকত দিদি যাবার বা ফেরার সময়, এখনো থাকে। কিন্তু এর পরিণতি তো আবার সেটাই হবে। দিদি ফিরেও যদি যায়, ও তো আবার নেশা করবে। আবার টাকার জন্য দিদিকে মারা শুরু করবে। আবার দিদি বাড়ি চলে আসবে। এই রিলেশনশিপ থেকে তো বেরলে এভাবেই বেরতে হবে। বাবা তো পাড়ার কয়েকজনের সাথে আলোচনাও করেছে। এরকম হলে অয়নদা মার খেয়ে যেতে পারে। এমনিতে পাড়ার লোকও ওর বিরুদ্ধে এখন। পাড়ার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে ইত্যাদি চলছে।

ও-মারটা কোন কাজের কথা হলনাকি। বরং ওনাকে যদি রিহ্যাবে পাঠানো যেত হয়ত কিছু লাভ হত।

সে- এখন আর কিছু করার নেই। দিদি জেদ ধরে আছে আর ফিরে যাবে না। আর দিদি ছাড়া অয়নদাকে কে নিয়ে যাবে রিহ্যাবে?ওর মা তো প্রায় শয্যাশায়ী।

ও- এভাবে সম্পর্ক ভেঙে বেরনো... আমি নিশ্চিত আপনার দিদি ভেতরে ভেতরে একেবারেই ভেঙে পড়েছেন।

সে- একেবারে পাথর হয়ে গেছে এখন। নো এক্সপ্রেশন। আজকাল কেমন একটা যেন লাগে। আগে বিয়ের কথা হলে রেগে যেত খুব।এখন একেবারেই নির্লিপ্ত। হঠাৎ হঠাৎ মার সাথে লেগে যায় বিনা কারণে। হয়ত মা বলল দোকান থেকে কিছু আনতে, বিনা কারণেই রেগে গেল। মানে ঠিক স্বাভাবিক না কোনকিছুই।

ও-হুম। খুবই জটিল পরিস্থিতি।

সে-জটিল তো বটেই। আচ্ছা ছাড়ুন।আপনার কথা বলুন। আপনার সেই বাগদত্তাটির খবর কি?

ও- ডেকে পাঠিয়েছিল একদিন।

সে-তারপর?

ও-তারপর বলছে বিয়ে করতে ওর দিক থেকে ইচ্ছাই আছে। কোন অসুবিধা নেই। ওই ছেলেটির প্রতি একসময় সামান্য ফিলিংস থাকলেও এখন কিছুই নেই।

সে- বাহ, তাহলে তো ভালই হল।বিয়েটা করে ফেলুন, এভাবে আর কদিন অচেনা অজানা মেয়ের সাথে রাস্তা ঘাটে ঘুরে বেড়াবেন?

ও- আশ্চর্য কথা বললেন তো,অচেনা অজানা মেয়ে তো ওই মেয়েটাও ছিল। বাড়ি থেকে কথা বলা মানেই কি পরিচিত হয়ে গেল।

সে- তা ছিল। কিন্তু বিয়ে যখন করতেই হবে তখন সেটা করে ফেলাই ভাল নয় কি?

ও-প্রব্লেম সেটা না। আমার আসলে ঠিক এই ধরণের ময়দা মাখা মেয়ে পছন্দ না। আমি শিওর ওর এক্স প্রেমিকটি যদি এস্টাব্লিসড হত তাহলে ও ওদিকেই যেত। আচ্ছা

বিয়ে হলেই কি সব গল্প শেষ হয়ে যায়? আমার কিন্তু সেটা মনে হয় না।

সে-হি হি। ময়দা মাখা মানে?

ও-ময়দা মাখা মানে ময়দা মাখা। একগাদা মেক আপ। ন্যাকাটোনে চোদানো। সরি, বাজে কথা বলে ফেললাম।

সে-হি হি।ওরে বাবা। আপনি তো বেশ মজার কথা বলেন। এত গম্ভীর গম্ভীর থাকেন কেন তাহলে?

ও- আমি এক্সট্রিমলি সরি।আসলে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার ন্যাকা মেয়ে একেবারে সহ্য হয় না।

সে- তাহলে এই মেয়েটার সাথে মত দিয়ে দিয়েছিলেন কেন?

ও-জানি না। বাড়ির চাপাচাপিতেই মে বি। কিংবা তখন...

সে- কিংবা কী?

ও- না না, থাক।

সে- থাক তবে।

ও- হ্যাঁ। সেটাই ভাল।

১১।
।।উপমন্যু।।
সম্প্রীতিকে আমি বুঝে উঠতে পারি না। ভুল বললাম। সম্প্রীতি কেন, পৃথিবীর কোন মেয়েকেই আমি বুঝে উঠতে পারি না। এরা যে কী চায়, এদের কী দাবী, আদৌ কোন দাবী আছে কি না, সেটা নিয়ে গভীর গবেষণা হওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়। একটা মেয়ে যার বাপ কিনা হিটলারের ছোট ভাই হবার দৌড়ে খুব সামনের সারিতে থাকবে, যে কিনা পরিষ্কার মেয়ের উড বি কে বলে দিয়েছে তুমি বাপু আমার মেয়ের সাথে দেখে করতে পারবে না বিয়ের আগে, তাও আমাদের বাড়িতে কখনও সখনও এবং মেয়েটাও পুরোপুরি ব্যাপারটাকে সাপোর্ট করেছে বলে আমি তখন বুঝলাম, সেই কিনা হঠাৎ ফোন করে বসল সকাল সকাল "আজ অফিস যেতে হবে না। হাইল্যান্ড পার্কে আস, দশটা নাগাদ। আমি কলেজ যাব না"।
আমি আমতা আমতা করে কিছু বলার আগেই ফোন কাট। এ কী অবস্থা আমার! এইভাবে আমি তো একদিন শিওর পাগল হয়ে যাব। এই কদিন আগে বলে যাচ্ছিল আমি পারব না বাবার মত ছাড়া দেখা করতে, একদিন দেখা করার মধ্যেও কত লুকোচুরি! তার পরের দিন আবার বাজিয়ে দেখা আমার সেই দম আছে নাকি ওর বাবার সামনে গিয়ে ওকে নিয়ে আসার, এখন আবার এই ফরমান, কিছু করার নেই, অফিসে ফোন করে বলে দিলাম বেজায় পেট খারাপ হয়েছে, একেবারেই যাবার

উপায় নেই কোন। ট্রেনিং মিস করছি বলে একটু কাঁদুনিও গেয়ে নিলাম। ট্রেনার ভদ্রলোক মানুষ, আমাকে সান্ত্বনাই দিলেন এই বলে যে ঠিক আছে নেক্সট স্যাটারডে চলে এস ব্যাকলগ থাকলে তুলে দেব(মানে উইকেন্ডের ছুটিটাও একদিন গেল আর কী)।
কোনমতে স্নান টান সেরে হাইল্যান্ড পার্কে যখন পৌঁছলাম তখন সাড়ে দশটা বেজে গেছে। সম্প্রীতি দাঁড়িয়ে ছিল এন্ট্রান্সের সামনে। আমাকে আসতে দেখে দরজা খুলে ভিতরের দিকে হাঁটা শুরু করল। আমি তাড়াতাড়ি ওর পাশে পৌঁছে বললাম "ভেরি সরি, লেট করে ফেললাম"।
সম্প্রীতি আমার দিকে তাকিয়ে ফিক করে সেই ভুবনজয়ী হাসিটা হেসে বলল "লেট করে ফেললে? আমি এই পাঁচ মিনিট আগে এসছি। ভাবলাম আমিই লেট করেছি"।
আমি আশ্বস্ত হলাম টাইমটেবিল টাইপ মেয়ের সাথে বিয়ে হবে না ভেবে। বললাম "এখন প্ল্যানটা কি সেটা জানতে পারি কি?"
সম্প্রীতি বলল "সিনেমা দেখা যাক?"
"সিনেমা? কিন্তু সেটা তো দেখে যেতে হবে, আমরা কথা বলব না কিছু?"
"কথা বলতে হবে? সেটা সিনেমা দেখার পরে হয় তো। আমি পাঁচটা অবধি আছি আজ। তুমি থাকতে পারবে তো?" চোখে চোখ রেখে এই মেয়ে যখন কথা বলে মনে হয় আমার হার্ট ফেল হয়ে যাবে। কোন মতে বললাম "সে তো দশটা অবধিও থাকতে পারব। আমার কোন অসুবিধা নেই। দিনটা ছুটি নিয়ে নিলাম তো। আমি তো ভেবেছিলাম তুমি তোমার বাবার..."
সম্প্রীতি আমায় থামিয়ে দিয়ে বলল "ওসব কথা এখন না, আগে চল একটা সিনেমা দেখি, তারপর লাঞ্চ তারপর কথা..."
সিনেমা দেখে বেরিয়ে লাঞ্চে বসেই মেয়েটা যে কথাটা প্রথম বলল সেটা হল "আমার তোমাকে কিছু বলার আছে"।
আমি লাঞ্চ অর্ডার করে এসছিলাম, খানিকক্ষণ পর খাবার আনতে যেতে বলেছে, ওর কথাটা শুনে বললাম "হ্যাঁ বল"।
সম্প্রীতি বলল "আমার সাথে একটা ছেলের ফোনে কথা হত। মাধ্যমিকের পরে যে ছুটিটা থাকে সেই সময়। বাবা স্কুলে যেত, মা রান্নায় ব্যস্ত আর ঐ সময়টা আমি ফোনে কথা বলতাম। সারাদিন, অনেকখানি সময় জুড়ে। বাবা একবার বেশ কয়েকবার এনগেজ পেয়েছিল। তারপর ঠিক ধরে ফেলেছিল। ছেলেটা বাবার ছাত্র ছিল। বাবার কাছে পড়তে আসত। আমার থেকে এক বছর সিনিয়র। বাবা তারপর ফোনের লাইনও কেটে দিয়েছিল। ছেলেটাকে যা নয় তাই বলে অপমান করেছিল। ছেলেটা সুইসাইড অ্যাটেম্পট করেছিল। তারপর পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায় ছেলেটার। ন্যালাক্যাবলা হয়ে যায়। বাবার দোকান আছে, সেটাই দেখে। আমাকে দেখলে এখনও শিউরে ওঠে।আমি এখনও বুঝে উঠতে পারি না ছেলেটাকে দেখলে আমার ভীষণ কষ্ট হয় কেন। আমি ওকে ভালবাসি
নাকি সেটাও জানি না। আমার মনে হয় তোমার এটা জানা দরকার"।
কাঁচের বাইরে থেকে একটা ব্যস্ত কলকাতা দেখা যাচ্ছে,বাস গাড়িগুলো মানুষের সমস্যার বোঝা নিয়ে একটার পর একটা বেরিয়ে যাচ্ছে, আর আমার ভেতরটা হঠাৎ কেমন যেন তিতে হয়ে গেল এই কথাটা শোনার পরে। আমি কি বলব বুঝতে পারলাম না। সম্প্রীতির দিকে তাকিয়ে বললাম "তুমি কি এই কথাটা বলার জন্যই আমাকে ছুটি নিতে বললে আজ?"
সম্প্রীতি আমার দিকে স্থির চোখে তাকাল। বলল "না, এই কথাটা আমার তোমাকে

জানাবার প্রয়োজন আছে বলে বললাম। একটা সম্পর্কে যাচ্ছি, সেটা মিথ্যা দিয়ে শুরু হোক আমি সেটা চাই না। আর তোমাকে এখানে আসতে বলেছি, কারণ তুমি আসলে ভাল লাগবে তাই। তোমার যদি মনে হয় এটা ঠিক না আমাকে বলে দাও, আমি আর কোনদিন তোমাকে এভাবে ডাকব না। আমার বাবা মাও জানে না আমি এখানে এসেছি।আমি কোনদিন বাড়ির অমতে কোন কাজ করি নি। এবার মনে হয়েছিল করা যেতে পারে”।
তিতে ভাবটা কেটে গিয়ে কেমন একটা ভাল লাগা শুরু হচ্ছিল ভিতর ভিতর।
সম্প্রীতিকে বললাম “সরি। একটু হিংসা হচ্ছিল আসলে”।
“হিংসা? হিংসা কেন?”
“হিংসা হবে না কেন? হিংসা না হবার কোন কারণ আছে কি? আমি তো সবসময়েই চাইব প্রথম হতে। সেকেন্ড কে হতে চায়?”
সম্প্রীতি বাইরের দিকে তাকাল। একটু অপ্রতিভও হল সম্ভবত। বলল “সেই সময়টা আমার কী হয়েছিল জানি না। পড়ার ওরকম চাপ ছিল বাড়ি থেকে। বাবা খুব শাসনে রাখত। ওর সাথে কথা বলতে ভাল লাগত নাকি জানি না, কিন্তু মনে হত ঐ লুকিয়ে কথা বলার মধ্যে একটা অ্যাডভেঞ্চার আছে যেটার আমার ভীষণ দরকার ছিল। বাবা ছেলেটাকে যা ঝেড়েছিল তার সিকিভাগও আমাকে ঝাড়ে নি। কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমি যে ভয়টা পেয়েছিলাম সেটা ভাবলে এখনও শিউরে উঠি। এভাবে কোনদিন তোমার সাথে দেখা করব স্বপ্নেও ভাবি নি। কিন্তু আজ হঠাৎ ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে মনে হল তুমি হঠাৎ করে কোন দমকা হাওয়ার মত এসে গেছ আমার জীবনে। মনে হল, তক্ষুণি তোমার কাছে ছুটে যাই। অনেক আগে পরে ভেবে নিজেকে সামলাতে পারলাম না। তোমাকে ফোন করে দিলাম। আমার এখনও মনে হয় নি আমি কোন ভুল কাজ করেছি। এবার তুমি সিদ্ধান্ত নাও তুমি প্রথম না দ্বিতীয়”।
মেয়েটার সোজাসুজি কথা বলা আমাকে হঠাৎ একটু চাপে ফেলে দিল।আমার খুশি হওয়া উচিত ছিল কিন্তু সেটা হতে পারলাম না। আমার হঠাৎ মনে হতে লাগল আমি সম্প্রীতিকে ঠকাচ্ছি। তেতো ভাবটা আবার ফিরে এল নিজের অজান্তেই।
আর এই তেতোভাবটাকে আরও অন্য ভয়ংকর কিছুতে কনভার্ট করতেই যেন, তানিয়াদি ঢুকল রেস্তরাঁটায়। সাথে বেশ হ্যান্ডসাম একটা ছেলে। একেই মনে হয় বলে “কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা”!
আমি ফ্যাল ফ্যাল করে সেদিকে চেয়ে থাকলাম।

১২।

তোমাকে,
আমাদের পাড়ার তন্ময়দা আর মানালীদির প্রেমের কাহিনী বিখ্যাত। রোমিও জুলিয়েটের মত ব্যাপার ছিল ওদের, দুই বাড়ি কিছুতেই মানবে না, সর্বক্ষণ ঝামেলা লেগেই আছে। একদিন দুজন বাড়ি ফিরল না। অনেক রাতে জানা গেল তারা পালিয়ে গেছে। তন্ময়দার বাবা পাল জ্যেঠু আর মানালীদির বাবা দাস জ্যেঠু তুমুল ঝগড়া ইত্যাদি করল। তারপর থেকে দুই পরিবারে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। ওরা কলকাতাতেই অন্য একটা জায়গায় বাড়ি ভাড়া করে থাকত। পাড়ার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ ওদের বাড়িতেও গেছে।
একদিন হঠাৎ জানা গেল মানালীদি সুইসাইড করেছে। দাস জ্যেঠু জ্যেঠী পড়িমড়ি

করে দৌড়ল ওদের বাড়িতে। তন্ময়দা নাকি আরেকজন মেয়ের সাথে লিভ টুগেদার শুরু করেছিল। মেয়েটাকে মাঝে মাঝে নিয়েও আসত বাড়িতে। মানালীদি সেটা একেবারেই মেনে নিতে পারে নি। যার জন্য ঘর বাড়ি সব ছেড়ে গেছিল সে যে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করবে সেটা কি করে জানবে!
এই ঘটনাটা আমার পৃথিবীটা কেমন যেন ওলট পালট করে দিয়েছিল। সেই সময় দিদি আর অয়নদার ঝামেলাটাও শুরু হয়েছে।
আমার সব কিছু তেতো লাগা শুরু করল তখন থেকে। জানি না, এখনও সেই তেতো ভাবটা কেটেছে নাকি।
এসব কিছু সত্যি হয় তো? নাকি পুরোটাই আসলে একটা অভিনয় চলে! ছেলেরা তো বাই ডিফল্ট পলিগ্যামী হয়। সম্পর্কে থেকেও আসলে সম্পর্কে থাকে না তারা। এদিকে মেয়েদের তো রাত দিন সেটাই চিন্তা থাকে, কখন সে আসলে কি রান্না করবে, কী খাওয়াবে, তার দুনিয়াটা জুড়েই তো ছেলেটা থাকে। এভাবে সব কিছু কিভাবে ভেঙে চলে যেতে পারে ছেলেটা? কেনই বা করে? আমি বুঝে উঠতে পারি না।
আজকাল এমন হয়েছে ঘরে থাকলেই আমার মাথার মধ্যে এই সব চিন্তা ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে থাকে, আমার পাগল পাগল লাগে।
রাস্তা ঘাটে ঘুরে বেড়ানোর সময় খানিকটা ভুলে থাকতে পারি সব কিছু। সে কারণেই বেরিয়ে যাই।
অনেক বাজে কথা বলে ফেললাম তাই না? তোমার চিঠির অপেক্ষায়।
আমি।
(পুনশ্চ- কতদিন পর চিঠি লিখলাম মনে করতে পারছি না, আদৌ কোনদিন লিখেছি নাকি তাও মনে নেই। যাই হোক, এবার তোমার চিঠির অপেক্ষায় থাকলাম)
#
তোমায়
স্কুলের সেই মেয়েটার কথা বলেছিলাম তোমায়? মিউজিক টিচার কদিন যার সাথে প্রেম প্রেম খেলা খেলেছিল? তারপরে জানা গেল তিনি বিবাহিত! মেয়েটা স্কুলে আসত আচ্ছন্নের মত। ওকে সাপোর্ট দিতে গিয়ে ভেতরে ভেতরে ভেঙে যেতাম আমি, প্রেমে পড়ে গেছিলাম পাগলের মত। এদিকে পরীক্ষার চাপ, তবু সারাক্ষণ ভেবে যাচ্ছি ওকে কিভাবে একটু ভাল রাখা যায়। তবু আটকাতে পারলাম না।
মাধ্যমিক শুরু হবার আগের দিন পাড়ার পুকুরে সকালবেলা ওর শরীরটা ভেসে উঠেছিল। আমি যে কি করে মাধ্যমিক পাশ করেছিলাম আমিই জানি। সে সময়টা অনেক ভেবেছিলাম। তারপর তুমি যেরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে, আমিও অনেকটা সেরকম সিদ্ধান্তই নিয়েছিলাম। সম্পর্কগুলি এতই ভঙ্গুর যে এগুলি দেখলে ঠিক সাহস জুগিয়ে উঠতে পারি না কোন কিছুতে জড়িয়ে পড়ার মত করে। তনুশ্রী মেয়েটাকে দেখে সাময়িক ভাবে বিচ্যুত হয়েছিলাম ঠিকই কিন্তু সেই ভুলটা একদিনেই ভেঙে গেল যেদিন ওর বয়ফ্রেন্ড আমাকে ফোন করে ফেলল। আমি সে দিনটা একটা শকের মধ্যে ছিলাম জানো! তারপরে একসময় মনে হয়েছিল, আরে! এটা তো আমার ভালোর জন্যই হল! আমি তো আসলে অভিনয় করে যাচ্ছিলাম কদিন ধরে। একটা সম্পর্কে থাকার অভিনয়, আসলে এই যে আমরা এই সম্পর্কগুলিতে জড়িয়ে পড়ি সেটা তো পুরোটাই শরীরের জন্য। শরীরের চাহিদা ফুরিয়ে গেলে স্ত্রীর গয়না গাটি আর শখ আহ্লাদ মনে আসে, স্বামীর তখন আবার অন্য মেয়েমানুষের জন্য ছুকছুকানি শুরু হয়ে যায়।
এটাই তো সার সত্যি কথা তাই না? তাহলে রোজ রোজ এত ছেলে মেয়ে প্রেমে পড়ছে

তার ডেস্টিনেশন আসলে ওই একই!
আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছি দিনের পর দিন। জানিনা কি করব এরপরে।
চিঠিটা সত্যি অনেক কথা বলিয়ে দেয় যেটা সামনা সামনি বলা যায় না।
ভাল থেকো।

#
তোমাকে
কাল সারাদিন কলকাতায় হাঁটব ঠিক করেছি। পাশে থাকবে?
ইতি

১৩)
।।উপমন্যু।।

-সেদিন ঐ ভদ্রমহিলা কে ছিল?
-কে? কে বলত?
-ঐ যে একজন ঢুকলেন। একটু বড় হবেন আমাদের থেকে। তুমি দেখে কেমন ভয় পেয়ে গেছিলে
-নাহ মানে তেমন কেউ না।
-তুমি মিথ্যা বলতে পারো না জানো তো! ধরা পড়ে যাও।
-কে আমি? মিথ্যা কেন বললাম? কিছু বলি নি তো।
-তাহলে বলছ না কেন সত্যিটা? কে ঐ মহিলা?
সম্প্রীতি বেশ কঠিন চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি কী বলব বুঝে উঠতে পারছি না। আমি একটু থেমে বললাম "প্রায় পাঁচ দিন হয়ে গেল। সেদিন কিছু জিজ্ঞেস করলে না, হঠাৎ আজকে এই প্রশ্ন কেন?"
সম্প্রীতি বলল "সেদিনটা আমি নষ্ট করতে চাইনি বলে। আমি ভেবেছিলাম এই নিয়ে তোমাকে কিছু বলবও না। কিন্তু কেন জানি না বার বার মনে হচ্ছে সেদিন কিছু একটা ছিল যেটা তুমি আমার থেকে লুকোচ্ছো কিংবা তোমার কাছে ব্যাপারটা মোটেও comfortable না। আমি জানতে চাই, সমস্যাটা কী?"
-সমস্যার কী আছে। আমার অফিসে ওইরকম দেখতে একজন বস আছেন। আমি ভেবেছিলাম ইনি বোধহয় তিনিই। তারপর তো দেখলে ঠিক হয়ে গেলাম। অফিসে ঢপ মেরে ছুটি নিয়েছিলাম না?
সম্প্রীতি মনে হয় খানিকটা কনভিন্সড হল এই কথাটা শুনে । বলল "ও। আমি ভাবলাম আগে কোন কিছু করেছ হয়ত ওই মহিলার সাথে। সেদিন দেখে চমকে গেলে তাই"।
একটা হার্টবিট মিস হল আমার সম্প্রীতির কথা শুনে। তবু মুখে জোর করে হাসি এনে বললাম "অত বড় মহিলার সাথে আমি কী করব বলত? আমার অত ক্ষমতা নেই"।
সম্প্রীতি এবার হেসে ফেলল আমার কথা শুনে। ভেতরে ভেতরে আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ছিল।
অবশ্য মেয়ে তো। এত সহজে হাল ছাড়ে না। তারপরেই একটা মিসাইল ছাড়ল "তুমি

কী দেখে আমার প্রেমে পড়লে?"
এই সেই প্রশ্ন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন মেয়েদের কাছে। এবং সব থেকে বিরক্তিকর প্রশ্ন ছেলেদের কাছে। কি উত্তর দেওয়া যায় বলুন তো এই প্রশ্নের? কী দেখে প্রেমে পড়লাম? ওকে দেখেই তো।
সেটাই বলে ফেললাম "কেন? তোমাকে দেখে তোমার প্রেমে পড়েছি"।
সম্প্রীতি আবার রাগল "আমাকে দেখে? মানে আমার চেহারা দেখে আমার প্রেমে পড়ে গেলে? আমার মন কিরকম, কি গুণ আছে তার কোন কিছুই জানতে চাইলে না?"
আমি হেঁহেঁ করে একটু হাসার চেষ্টা করে বললাম "ওই তো তোমাকে দেখার পরই এগুলি জানতে ইচ্ছা করল"। সম্প্রীতি আবার খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল।
আমি বুঝতে পারছিলাম না সম্প্রীতিকে কিভাবে খুশি করব। এই মেয়েটার মুড যে কখন লোডশেডিং হয়ে যায় তা ভগাদাই জানে। এত সুন্দর গঙ্গার তীরে হাওয়া খাচ্ছি আমরা, কোথায় বাকিদের মত ভক্তি গদগদ চিত্তে পরস্পরকে দেখে সময় কাটিয়ে দেওয়া যেত, তা না, উনি মুড অফ করে বসে থাকবেন। উইকেন্ডে হাফ বেলা করে অফিস থেকে সোজা চলে এসেছি দক্ষিণেশ্বর। সম্প্রীতি কলেজ থেকে চলে আসবে বলেছিল। এসে দেখছি আগে থেকেই দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে দেখে হাসল। আমি বললাম "পুজো দেবার প্ল্যান আছে নাকি?"
সম্প্রীতি আবার হেসে বলল "না আমার এই পরিবেশটা খুব ভাল লাগে। চল গঙ্গার ধারটায় গিয়ে বসা যাক"।
আমি আর ও পাশাপাশি বসে গঙ্গা দেখলাম। কখনো কখনো ওর আঙুল এসে লাগছিল আমার আঙুলে। যে কারেন্টটা লাগছিল সেটা অবশ্য ক্ষণস্থায়ী। তারপর পরই ও আঙুলটা সরিয়ে নিচ্ছিল। আমার অস্বস্তি হচ্ছিল অন্য একটা ব্যাপারে। তানিয়াদির সাথে যে শারীরিক সম্পর্কটা আমার তৈরি হয়েছিল সেটা আমাকে বেশ কিছুদিন পাগল করে দিয়েছিল। সম্প্রীতির সাথে সম্পর্কে শরীর আসার কথা না যদিও। অন্তত বিয়ের আগে তো নয়ই। কিন্তু আমাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়ে শরীর এসে পড়ছিল। এই কারেন্টগুলো আমাকে সেই দিনগুলিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি নিজেকে রেজিস্ট করতে পারছিলাম না। আর এই সময়েই অবশ্য র‍্যাপিড ফায়ার রাউন্ডটা নিয়ে এসে সম্প্রীতি আমার মনটাকে খানিকটা অন্যদিকে নিয়ে গেল। তানিয়াদির কথাটা ও যখন জিজ্ঞেস করল, আমার মনে হচ্ছিল আমার শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে চলে গেল।
সম্প্রীতি বলল "আচ্ছা তোমার কি কলকাতা ছাড়া অন্য কোথাও ট্রান্সফার হতে পারে?"
আমি সত্যি কথাটাই বললাম "হ্যাঁ পারে তো। যে কোন রাজ্যে, যে কোন দেশে"।
সম্প্রীতি এবার খানিকটা উৎসাহিত হল "ভেরি গুড। আমার খুব ঘুরতে ইচ্ছা করে। তুমি অফিস থেকে ফিরে আসবে, তারপর আমরা বাইরে ঘুরতে যাব। ভাল হবে তাই না?"
আমি এই উত্তরটা আবেগে গদগদ হয়ে দিতে যাব আর তখনই আমার চোখ কপালে উঠল। পিঙ্গল। সাথে আরেকটা মেয়ে। হাঁটতে হাঁটতে এদিকেই আসছে। আর পিঙ্গল আমাকে দেখে মোটামুটি ভূত দেখার মত চমকে উঠল।
আমি বুঝতে পারছিলাম না, কি করব। তারপর ঠিক করলাম ওর কোর্টে বল ছেড়ে দি, দেখি ও কি করতে চায়।
পিঙ্গল বুঝে গেছে আর কিছু করার নেই। পাশের মেয়েটাকে কি বলে আমাদের দিকেই এগিয়ে এল। আমি তো জানি পিঙ্গল উইকেন্ডেও কাজ করে, আজকাল

আমাদের লুকিয়ে প্রেম করছে এটা তো বিরাট ব্রেকিং নিউজ হতে যাচ্ছে যা বুঝতে পারছি।
পিঙ্গল এগিয়ে এসে আমাকে ডাকল, আমি সম্প্রীতিকে বললাম “আমার দাদা। আমি একটু আসছি”।
সম্প্রীতি একটু অবাক হল কিন্তু কিছু বলল না, আমি এগিয়ে গেলাম। পিঙ্গল আমায় দেখে হাসল বলল “তুই কিন্তু যেটা ভাবছিস সেটা না। আমরা আসলে বন্ধু”।
আমি অবাক গলাতেই বললাম “হ্যাঁ সে ঠিক আছে কিন্তু অফিস পালিয়ে এলে নাকি?”
পিঙ্গল ইশারা করল গলার আওয়াজটা নামাতে, বলল “আরে ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছিস কেন? চুপ কর। গত কয়েকদিন ধরে কথা হচ্ছে ওর সাথে। কিন্তু এখনও কনক্রিট কিছু না”।
আমি বললাম “ওহ আচ্ছা। আলাপ করিয়ে দাও”।
মেয়েটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। পিঙ্গল ওকে ডাকতেই ও এইদিকে ফিরে এগিয়ে এল। আমিও সম্প্রীতিকে ডেকে নিলাম। পিঙ্গল বলল “সম্প্রীতির নাম আমি শুনেছি, কিন্তু দেখা হয় নি আগে। তা কতক্ষণ এসেছ তোমরা এখানে?”
সম্প্রীতি পিঙ্গলের সাথে থাকা মেয়েটার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে বলল “আরে, তুই? তোকে এখানে দেখব কোনদিন ভাবিই নি রে পায়েল। আমাকে চিনতে পারছিস?”
মেয়েটা যার নাম বুঝলাম পায়েল সম্প্রীতির প্রশ্নটা শুনে বেশ অবাক হল, বলল “না তো। আমি তো ঠিক আপনাকে...”
সম্প্রীতির উৎসাহর কোন ঘাটতি পড়ল না, বলল “আরে তোর নাম পায়েল তো?”
মেয়েটা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল, বলল “হ্যাঁ কিন্তু আমি তো মনে করতে পারছি না ঠিক কোথায় দেখেছি...”
সম্প্রীতি বলল “আরে আমি অয়নদার মাসতুতো বোন, বিয়ের সময় দেখা হয়েছিল না? কত কথা। ভুলে গেলি সব?”
পায়েল খানিকটা সাদা হল কি সম্প্রীতির কথা শুনে? ঠিক বুঝতে পারলাম না। তবে সামলে নিল খুব তাড়াতাড়ি, বলল “হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। আসলে অনেক দিন হয়ে গেল তো! তোমার মেমোরি তো খুব শার্প”।
আমি পিঙ্গলের দিকে তাকালাম পিঙ্গল আমার দিকে। আমার কেন জানিনা মনে হচ্ছিল মেয়েটা কিছু একটা লুকোতে চাইছিল। পিঙ্গলেরও কি সেরকম কিছু একটা মনে হচ্ছিল? নাকি মেয়েটার সম্পর্কে সব কিছুই জানে।
আমি পিঙ্গলকে আলাদা করলাম “কী কেস বল তো? মেয়েটা কে? কোথায় থাকে? কী পরিচয়? তনুশ্রীর কী হল?”
পিঙ্গল চোখ বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল “তনুশ্রী আছে তো। বিয়ের কথা চলছে তো”।
আমি অবাক হয়ে বললাম “তাহলে এ কে?”
পিঙ্গল একবার আমার দিকে আর একবার মেয়েটার দিকে তাকিয়ে দেখল মেয়েটা সম্প্রীতির সাথে কথা বলছে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হেসে পিঙ্গল বলল “এই মেয়েটাকেই আমি বিয়ে করব একদিন। দেখে নিস”।
আমি কি বলব বুঝতে না পেরে থম মেরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

।।১৪।।

।।সে।।
-এই দিদি ঘুমিয়ে পড়লি?
-ঘুমিয়ে পড়লাম মানে? এখন কটা বাজে দেখেছিস? দেড়টা হতে চলল।
-সেতো জানি। কিন্তু তুইও তো একডাকেই সাড়া দিলি।
-হু। কী বলবি বল।
-জেগে জেগে কী ভাবছিলিস?
-কিছু না।
-আরে বল না। আর কত গুমরে থাকবি?
-গুমরে থাকব মানে?
-তুই এতটা চুপ কী করে থাকিস বল তো? আমি সত্যিই বুঝি না তোকে।
-হু...
-কি হু? এরকম করছিস কেন বল তো?
-তুইই বা কী করছিস মুন?
-কী করছি?
-পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস! নিজের লাইফটাকে আমার জন্য কেন নষ্ট করছিস?
-আমি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি না কিন্তু। এটা খুব ভুল ধারণা তোর। আমার আসলে বাড়িতে থাকতে এক্কেবারে ভাল লাগে না।
-সেটাই তো বলছি। আমার জন্যই তো সেটা।
-দেখলি? তুই ঘুরে ফিরে আবার সব দোষ নিজে নিয়ে নিলি। তোর জন্য কেন হবে?
-আমার জন্যই। আমার জন্যই তো এবাড়ির পুরো আবহাওয়াই চেঞ্জ হয়ে গেছে।
-তুই আমাদের বাড়ির বাইরের কেউ না দিদি। তোর জন্য যদি বাড়ির আবহাওয়া চেঞ্জও হয়ে থাকে তাতেও বেশ হয়েছে। তোর সেই অধিকার আছে বাড়ির আবহাওয়া চেঞ্জ করার।
-প্রেম করছিস না তুই?
-অ্যাঁ! এ আবার কেমন প্রশ্ন? হঠাৎ এই প্রশ্ন কোত্থেকে চলে এল?
-মুন, আমার কাছে লুকোবি না একদম। সত্যি করে বল তো! তুই প্রেম করছিস না?
-না। একদম না। একেবারেই না। তোর কল্পনাশক্তি খুব বেড়েছে দেখতে পাচ্ছি।
-আমি তোর দিদি বুঝলি। এই সব দিন তো আমিও পেরিয়ে এসছি। আগে তো হেঁটে এসে এত ক্লান্ত থাকতি যে বিছানায় শুলেই ঘুমিয়ে পড়তি। ইদানিং দেখছি, ঘুমাসই না! এমন কি আমি ঘুমালেও তুই ঘুমাস না। গত পনেরো দিন ধরে আমি চুপচাপ তোকে দেখে যাচ্ছি। ছেলেটা কে?
-তুই কিছুই বুঝিস নি। ওরকম কেউ নেই। কেউ যদি থাকত তাহলে তো অনেক সমস্যা হত তাই না?
-কি সমস্যা হত? বাড়িতে ডিভোর্সি দিদি থাকার সমস্যা?
-ছি দিদি। তোর মুখে কি কিছুই আটকায় না? আমি কোনদিন একথা ভাবতে পারি? আর এখনই বললি আমাকে নাকি খুব চিনিস?
-নাহ। কথায় তোর সাথে পারা যাবে না বুঝছি। ঠিক আছে। তুইই বল সমস্যা কি?
-সমস্যা মানে, আমি এখনও ঠিক প্রিপেয়ারড নই। আমার এসবের ওপর এখন আর ঠিক বিশ্বাস হয় না।
-প্রেমে?
-হ্যাঁ। এটা ভোলাটাইল ব্যাপার আসলে। আজ প্রবলভাবে থাকবে, অথচ দুদিন পর আর সেটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

-অয়নের কথা বলছিস? নাকি আমার কথা বলছিস?
-আবার ঘুরে ফিরে সব নিজের দিকে টানলি? এটা তো সাধারন ব্যাপার। সবার ক্ষেত্রেই হয়
-হু। ভালবাসা আসলে শেষ হয় না। ভালবাসার রূপান্তর ঘটে। অয়নকে দেখিস? আমার থেকে ওর মদ গাঁজায় ভালাবাসাটা রূপান্তর ঘটেছে আসলে। হিহি।
-মোটেই না দিদি। অয়নদা তোকে এখনও ভালবাসে।
-বাবাহ। তুই তো অনেক কিছু জানিস দেখছি! ভালবাসার কি দেখলি?
-নইলে অয়নদা এটা কখনো করত? আসানসোলের কেসটা...
-ওটা ভালবাসা না। হিংসা। রাগ। যে আমি ভাল নেই। তোমাকেও থাকতে দেব না।
-আমার সেটা মনে হয় না।
-ঘুমা।
-হয়ে গেল? তোর কথা বলা হয়ে গেল? আবার খোলসের মধ্যে ঢুকে গেলি তুই?
-ঢুকবই তো। তুই আগে বল ছেলেটা কে?
-কোন ছেলেটা?
-অনেক তো হল। এবার বলেই ফেল।
-না রে কেউ নেই।
-সত্যি?
-সত্যি সত্যি সত্যি।
-তাহলে খেতে খেতে অন্যমনস্ক হয়ে ওরকম ফিক ফিক করে হাসছিলি যে?
-ও তোর চোখের ভুল দিদি।
-থাক তাহলে আর কথা নেই তোর সাথে। তুই ঘুমিয়ে পড়।
-আচ্ছা। আচ্ছা। বলছি বলছি।
-হু বল।
-তার আগে আমাকে ছোটবেলার মত একটু আদর করে দিবি?
-উফ। কত দাবী রে তোর। আয়। এবার বল আমি শুনি।

15

আপনিই পিঙ্গল?
পিঙ্গল বেশ জোরে হাঁটছিল অফিস থেকে বেরিয়ে। ডাকটা শুনে থমকে দাঁড়াল। রাস্তার মাঝখানে এরকম অজানা কণ্ঠস্বর শুনে খানিকটা অবাকও হল। ছেলেটার দিকে চোখ পড়তে অবাকই হল সে। বেশ আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে।
সে বলল “হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না?”
ছেলেটার উদ্ধত চোয়াড়ে ভঙ্গি। কিন্তু চেহারায় এমন একটা কিছু আছে যেটা দেখে ছেলেটাকে খারাপ বলে মনে হয় না। ছেলেটা বলল “আমি সৌমেন। আপনার সাথে একটু কথা ছিল”।
পিঙ্গল মনে করতে পারল না কে সৌমেন, জিজ্ঞাসু ভঙ্গিতে ছেলেটার দিকে তাকাল।
ছেলেটা বলল “আপনাকে একদিন তনুশ্রীর মোবাইল থেকে ফোন করেছিলাম”।
পিঙ্গল বুঝল এই ছেলেটিই তনুশ্রীর সেই আশিক। সে বলল “আচ্ছা আচ্ছা মনে পড়েছে। এখানেই বলবেন যা বলার?”
ছেলেটা বলল “হ্যাঁ। বেশি কিছু বলব না। শুধু বলব তনুশ্রীকে বিয়ে কেন করছেন? যে

মেয়েটা শুধু তার প্রেমিক বেকার বলে তাকে ছেড়ে ভাল থাকার জন্য এতদিনের একটা সম্পর্ক ভেঙে বিয়ে করতে চায় সেই মেয়েটাকে কেন বিয়ে করবেন বলুন তো?"
ছেলেটার কথা বলার ধরণ এবং স্পষ্ট কথা বলার ধরণ দেখে পিঙ্গল চমৎকৃত হল। সে বলল "চলুন কাছেই একটা সিসিডি আছে। একটু বসা যাক"।
ছেলেটা রাজি হল। তারা দুজন হাঁটতে হাঁটতে সিসিডিতে গিয়ে বসল। ছেলেটা বলল "আমি কিন্তু কিছু খাব না"।
পিঙ্গল বলল "একটু চা হোক। আপনি কি বলছেন আমি শুনতে চাই। কথাটা চায়ের সাথে হলে মন্দ হয় না"।
ছেলেটা অরাজি হল না। পিঙ্গল অর্ডার করে এল। তারপর বলল "হ্যাঁ এবার শুনি। তনুশ্রীর সাথে কতদিনের সম্পর্ক আপনার?"
ছেলেটা বলল "স্কুল লাইফ থেকে। আমি ক্লাসে স্ট্যান্ড করতাম। একই বয়সী আমরা। ও আমার থেকে সব নোটস নিত।পড়াশোনার দিক থেকে যত রকম সাহায্য ছিল সব রকমই করতাম।মাধ্যমিকের পরে প্রপোজটা ঐ করেছিল। তখন রঙিন দিন। সব কেমন গুলিয়ে গেছিল। অত ভাল ছাত্র ছিলাম অথচ উচ্চ মাধ্যমিকে প্রেমের চক্করে পড়ে সব শেষ হয়ে গেল। কোন মতে সেকেন্ড ডিভিশনে পাশ করলাম। তনুশ্রীও সেকেন্ড ডিভিশন পেল। কিন্তু পাশ কোর্সে একটা মেয়ে পড়তে পারে, একটা ছেলে পাশ কোর্সে পড়ে কি এমন ছিঁড়বে বলুন? ব্যাস! তারপরেও আমাদের সম্পর্কটা ছিল। তনুশ্রী আমাকে সান্ত্বনা দিত। আমিও ভেবেই নিয়েছিলাম ঠিক আছে, চাকরি না পাই, ব্যবসা অন্তত করে যেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি। তারপর হঠাৎ করে ওর সম্বন্ধ এল। ওর মা আমাকে বলল দেখ তোকে তো আমি নিজের ছেলের মত দেখি। তনুশ্রীর বিয়ে ঠিক হয়েছে। তোর কিন্তু অনেক দায়িত্ব। আমি তো শুনে আকাশ থেকে পড়লাম। এরকম না যে উনি কিছু জানতেন না আমাদের ব্যাপারে। আমি তনুশ্রীকেও জিজ্ঞেস করি তারপরে, ও আমাকে বলল মা তো ঠিকই বলেছে। তোর তো অনেক দায়িত্ব আমার বিয়েতে"। কথাগুলি বলতে বলতে ছেলেটার হেসে ফেলল। পিঙ্গলও হাসল। তারপর বলল "ইন্টারেস্টিং। ভাই টাই কিছু বলে বসে নি তো?"
ছেলেটা হেসে বলল "ওরকমই ব্যাপার ছিল। মানে আমরা একসাথে ঘুরেছি, সিনেমা দেখেছি, এসবই ওদের বাড়ির লোকেরা জানত পুরোটাই। হঠাৎ করে একটা ভাল সম্বন্ধ এসে পড়ায় যেন এদের আর মাথার ঠিক নেই। কী করে আমাকে কাটাবে। আপনাকে যখন ফোন করেছিলাম তখন আমার মাথা ঠিক ছিল না। প্রচন্ড রেগে ছিলাম ওর ওপর। ওদের বাড়িতে কেউ ছিল না। ও ছিল শুধু। চিরকালই ওদের বাড়িতে আমার অবাধ যাতায়াত। ওর ফোনটা বাগিয়ে ফোন করতে আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি। তারপরেও শুনেছি ও আপনার সাথে দেখা করে ইনিয়ে বিনিয়ে কান্নাকাটি করেছে। আমার মনে হয়েছে এ সব কথাই আপনাকে বলি। আমার ওর প্রতি হয়ত এখনও ভালবাসা খানিকটা পড়ে আছে, কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি ঘেন্না জন্মাচ্ছে আজকাল। আমি যদি কালকে হঠাৎ করে বড়লোকও হয়ে যাই, তাহলেও ওকে আমি বিয়ে করব না। কিন্তু আপনি আমাকে বলুন তো, এরকম একটা মেয়েকে জেনেশুনে আপনি বিয়ে করবেন?"
চা এসে গেছিল। পিঙ্গল ছেলেটাকে চা এগিয়ে দিল। তারপর বলল "কিন্তু আপনি হঠাৎ আমার উপকার করতে এলেন কেন? এই জায়গাটা তো বুঝলাম না। মানলাম আপনি মেয়েটাকে এখন আর ভালবাসেন না। কিন্তু এটাই বা কেন?"
ছেলেটা মাথা নাড়ল, "জানি না, আসলে আমিও একটু কনফিউসড মে বি। প্রেম ব্যর্থ হবার থেকেও নিজেকে কেমন একটা অসহায় লাগছে। এতদিনের ভালবাসা এভাবে

হেলায় ফেলে দিয়ে কেউ চলে যেতে পারে, এটা বোধহয় আমার সাথে না হলে আমি জানতে পারতাম না। কী করিনি আমি ওর জন্য। কলেজের ফর্ম তোলার লাইন থেকে শুরু করে ওরা বেড়াতে যাবার সময় ওদের মোট পর্যন্ত বয়ে দিয়েছি। এখন বুঝি, আসলে নিজেকেই চিপ করে ফেলেছিলাম আমি"।
পিঙ্গল বলল "বেশ মজা পেলাম আপনার কথা শুনে। তবে আপনি আমাকে পেলেন কী করে?"
ছেলেটা বলল "আপনি যেদিন তনুশ্রীর সাথে দেখা করেছিলেন সেদিন দেখেছিলাম। তারপর খবর পেয়েছিলাম আপনি z tech এ চাকরি করেন। কি মনে হল আজ চলে এলাম।আপনার অফিসের বাইরে চারটে থেকে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তনুশ্রীর জন্যও কোনদিন এতক্ষণ দাঁড়াই নি"।
পিঙ্গল বেশ শব্দ করে হেসে উঠল। বলল "এটা ভাল বলেছেন। আসলে আজকালকার দিনে সাফল্য আর ব্যর্থতা যদি টাকা পয়সার হিসেব দিয়ে বিবেচিত হয়। আপনি চাকরি পান নি বলে আপনার এতদিনের ভালবাসা মিথ্যে হয়ে যায়। ব্যাপারটা যথেষ্ট দুঃখ জনক। তবে একটা ব্যাপার আমি আপনাকে কনফার্ম করতে পারি। এই বিয়েটা আমি করছি না"।
ছেলেটাও হাসল। বলল "সেটা কি আমার কথার জন্য? না আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন?"
পিঙ্গল বলল "এককালে খারাপ লাগে নি মেয়েটাকে আমার। মিথ্যে কথা বলব না। কিন্তু আপনার ফোন পাবার পর থেকে আমার মধ্যে একটা পরিবর্তন আসে। ঐ ফোনটা শুনে আমার কখনোই মনে হয় নি আপনি ভাংচি দিতে ফোন করেছেন। বরং আপনার গলার স্বরে কোথাও একটা সততা খুঁজে পেয়েছিলাম। এমনিতে আমি রগচটা ছেলে। যদি মনে হত আপনি আমাকে হুমকি দিচ্ছেন, আমি আগে পিছে না দেখে যে করেই হোক এই বিয়েটা করতাম। কিন্তু সাম হাউ সেটা আমার মনে হয় নি। সেদিন থেকেই তনুশ্রীর থেকে আমার মনটা অনেকখানিই সরে যায়। অনেকটা জোর করেই যেন এই বিয়েটা হচ্ছিল। আজ থেকে আমি শক্ত হলাম। আর এর জন্য পুরো থ্যাঙ্কসটাই আপনার প্রাপ্য"।
সৌমেন চায়ে চুমুক দিয়ে বলল "আমার অবশ্য আরেকটা জিনিসও মনে হচ্ছে"।
পিঙ্গল বলল "কি?"
সৌমেন বলল "আপনার জীবনে অন্য কেউ আছে। আমি কি ঠিক বলছি?"
পিঙ্গল চমকাল কথাটা শুনে। বলল "আপনি কি করে বুঝলেন?"
ছেলেটা হাসল "কি জানি। মাঝে মাঝে এরকম মনে হয় আমার। পরে দেখি ঠিকই মনে হয়েছিল"।

পিঙ্গল বলল "আচ্ছা ধরুন আমি তনুশ্রীকে বিয়ে করলাম না। কিন্তু তাতেও কী লাভ? আপনি তো ওকে বিয়ে করবেন না"।
সৌমেন বলল "ওতে কি? এদের কোন চাপ আছে নাকি? ঠিক একটা না একটা টাকার থলেওয়ালা ছেলের গলায় ঝুলে পড়বে। দেখুন না, আপনি না করার দু দিনের মধ্যে কিছু না কিছু ভাল সাবস্টিটিউট পেয়ে যাবে। এরা তো মানুষকে বিয়ে করে না। ভাল থাকা, ভাল খাওয়া, ভাল শপিংকে বিয়ে করে। তারপর দুদিন পরে মোটা হয়ে গিয়ে কচি কচি ছেলে খুঁজে বেড়ায়। তারপর তার মাথাটা চিবিয়ে খায়। এদের

হাজব্যান্ডও দেখে না এদের দিকে। লাইসেন্স দিয়েই দেয়। যাও, যা পারো করে নাও”।
পিঙ্গল বড় বড় চোখ করে তাকাল সৌমেনের দিকে। বলল “বাহ, এই এক্সপেরিয়েন্সটা তো আমার নেই”।
সৌমেন বলল “ও আছে অনেক। আমার নিজের চোখেই দেখা”।
পিঙ্গল বলল “আচ্ছা তনুশ্রী কি ভার্জিন?”
প্রশ্নটা শুনে সৌমেন বলল “হ্যাঁ, ,মানে পার্শিয়ালি”।
পিঙ্গল বলল “ওহ...বুঝেছি। আমাকে প্রথমে বলেছিল ও নাকি ছেলেদের সামনে একটু শাই ফিল করে”। বলে পিঙ্গল হেসে দিল। সৌমেনও হাসল, বলল “এর আগেও একটা বড় কেস হয়েছিল। কলেজে একটা ছেলের সাথে জড়িয়ে পড়েছিল। তারপর একদিন কেঁদে এসে বলল ছেলেটা নাকি ওকে খুব জ্বালাতন করছে। আমি ছেলেটাকে চমকাতে গিয়ে দেখি উলটো কেস। কয়েকদিন ছেলেটার টাকায় খাওয়া দাওয়া করে সিমপ্লি কাটিয়ে দিয়েছে। শেষে আমি ছেলেটাকে বানানোর জায়গায় উলটে সিম্প্যাথি দেখিয়ে ঘুগনি টুগনি খাইয়ে এলাম”।
পিঙ্গল হো হো করে হেসে ফেলল। বলল “উফফ... আপনি যা তা লোক তো। ঘুগনি খাইয়ে এসছেন... হা হা হা... সত্যি যা তা ব্যাপার। যাই হোক, তনুশ্রীকে আজকের মিটিংয়ের ব্যাপারে আশা করি কিছু বলবেন না। আমি এমনিই কাটিয়ে দেব ব্যাপারটা”।
সৌমেন বলল “তা নিয়ে চিন্তা করবেন না। আজকাল কথা বলিই না। এককালে তো সারারাত কথা বলতাম। পুরোটাই আমার টিউশনের টাকায় মোবাইল রিচার্জ করে অবশ্য। নিতে তো এদের কোন অসুবিধা নেই। নিজের বাপ যত পয়সাওয়ালাই হোক এরা ঐ বয় ফ্রেন্ডেরটাই মারবে বুঝলেন?”
পিঙ্গল বাধা দিল “সবাই কিন্তু এরকম না। এভাবে জেনারালাইজ করাটাও ঠিক নয় বোধ হয়”।
সৌমেনের চা শেষ হয়ে গেছিল। বলল “আছে মার্কেটে... তবে খুব কম। সুন্দরবনের বাঘের মত বুঝলেন? বিলুপ্তপ্রায় হয়ে আসছে। আপনি যাকে ভালবাসেন তিনি এরকম নাকি? তাহলে বলতেই হচ্ছে আপনি জ্যাকপট পেয়েছেন। কোন সন্দেহ নেই পিঙ্গলবাবু”।
পিঙ্গল একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বলল “আপনি ঠিকই বলেছেন... কিন্তু এখনও তো কিছুই হল না সেরকম...”।
সৌমেন বলল “হবে। ফ্রিকোয়েন্সি ম্যাচ করলে সবই হবে। সত্যি কারের ভালবাসার জন্য কিছু হবার দরকার পড়ে না বোধ হয়। আপনার সাথে কথা বলে খুব ভাল লাগল জানেন? আজকাল তো লোকের খুব ক্লাস কনসাশনেস বেড়ে গেছে। যার তার সাথে কেউ কথা বলে না। আমার মত একটা রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ানো ছেলের সাথে কথা বললেন এটাও বড় কথা। আপনাদের মত লোকেদের কখনও খারাপ হয় না”।
পিঙ্গল বলল “কি জানি। আসলে ভয় লাগে। আমি একজনকে ভালবাসতাম এককালে। কেন বাসতাম জানি না। হঠাৎ ওয়ান ফাইন মর্নিং জানতে পারি মেয়েটা সুইসাইড করেছে। আমি সেইসময়টা একটা অস্বাভাবিক মেন্টাল শকের মধ্যে দিয়ে গেছিলাম। আমার ধারণা ছিল জীবনে আর কোনদিন কোন মেয়েকে ভালবাসতে পারব না। অনেকটা যন্ত্রের মতই এই বিয়েটা হচ্ছিল আমার।তারপর একদিন হঠাৎই সেই মেয়েটার সাথে পরিচয় হয়েছিল। জানিনা মেয়েটার মধ্যে কি আছে কিন্তু আজকাল মনে হয়, ওকে ছাড়া মনে হয় না আমি বাঁচতে পারব। কয়েকদিনের মধ্যে

অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে পড়েছি”।
সৌমেন পিঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বলল “আপনি ভাগ্যবান।সত্যিই। জানিনা আর কোনদিন আমাদের দেখা হবে কিনা তবে আমার মনে হয় আপনার সাথে যা হবে সব ভালই হবে। সেই ক্লিশে কথাটা মনে পড়ে গেল, যা হয় সব ভালর জন্যই হয়। আপনি সিগারেট খান? খেলে চলুন বাইরে গিয়ে ধরানো যাক”।

১৬)

মাঝে মাঝে হাত পা কাঁপে অয়নের। বলাই বলে নার্ভের প্রবলেম। বেশি নেশা করতে করতে নাকি একসময় এরকম হয়ে যায়। কাঁচের গ্লাস হাত থেকে পড়ে ভেঙেওছে এক দুবার। হাতের কাছে “জিনিস” না পেলে তার মাথা খারাপ হয়ে যায়। মনে হয় সব ভেঙে টেঙে দেয়।

ভাঙা তো আসলে লেগেই আছে। বাড়ির ঘর গুলি বহুদিন রং করা হয় না। একসময়ের ঝকঝকে দেওয়ালগুলোয় এখন কালো ছোপ ছোপ লেগে থাকে। মা বেশির ভাগ সময় অসুস্থ থাকে। বেশিরভাগ দিনই আজকাল অয়ন বাড়ি ফেরে না। কোন না কোন ঠেকে পড়ে থাকে। কিসে টাকা আসে, কেন টাকা আসে একটু নেশা কাটলে মনেও থাকে না তার। মাঝে মাঝে রাস্তা ঘাটে পুলিশ ধরে আজকাল দু ঘা দিয়েও দেয়। এসব অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে অয়নের। এই যেদিন মাধ্যমিকে স্টার পেল সেদিন সুদূর কল্পনাতেও আসে নি তার এইরকম কোন দিন দেখতে হবে। বরাবরই মেধাবী ছাত্র ছিল সে। এখন আর সেসব মনে থাকে না।

এদিক সেদিক কোন বাওয়াল হলে বলাই তাকে ডেকে নেয়, ওদের সাথে চলে গেল, নেশার ঘোরে দু ঘা দিয়েও দিল, কিছু টাকা পকেটে চলে এল, এভাবেই রোজগার আসছে আজকাল। কে ভেবেছিল, এসব করতে হবে তাকে। মাঝে মাঝে ফেরার পথে সোনার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। তখন হঠাৎ করে মনে হয়, তারও একটা বউ ছিল। যে কিনা একদিন তাকে ভালও বাসত। এখন কথা বলতে গেলে গটগট করে সামনে থেকে চলে যায়। কষ্ট হয় না, একথা কি করে বলবে অয়ন? এসব কি কষ্ট না হবার ব্যাপার?

এককালে রুটিন হয়ে গেছিল বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকাটা। তখন চোখে চোখ পড়লে শরীরে বিদ্যুৎ খেলে যেত। রাত্রে ঘুম আসত না যতবার সেই দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠত। এখনও নেশার ঘোরে সোনা আসে। প্রবলভাবেই আসে। সে আরও বেশি করে ছিলিমে মনোযোগ বাড়াবার চেষ্টা করে। হয় না। যত নেশা বাড়তে থাকে তত প্রবলভাবে সোনার স্মৃতি তাকে ঘিরে ধরতে শুরু করে। রাত অনেক হলে ওদের বাড়ির সামনে চুপচাপ বসে থাকে অয়ন। সোনা কোন ঘরে ঘুমায় সেটা সে জানে। সেদিকেই তাকিয়ে থাকে। আর তো কিছু করার নেই তার। পাড়ার কেউ কেউ আছে তার দিকে সমবেদনার দৃষ্টিতে তাকাত শুরুতে শুরুতে, এখন সেই দৃষ্টিটার পরিবর্তন হয়েছে অনেকটাই, খানিকটা ঘেন্না, কিছুটা অবজ্ঞা এসে পড়ছে। অয়ন নেশার মধ্যে থাকলেও চোখগুলি চেনার চেষ্টা করবে। “আহারে কত ভাল ছেলেটা কিভাবে নষ্ট হয়ে গেল” থেকে “ঐ যে নেশাখোরটা আবার বেরিয়েছে রাস্তায়” দৃষ্টিগুলি চিনতে খুব একটা কষ্ট হবার কথা নয়।

কদিন আগে পাড়ায় একটা বড় বাওয়াল হল। একটা বেপাড়ার ছেলে এক মেয়ের ঘরে ঢুকে পড়েছিল। মেয়েটারই আমন্ত্রণে সম্ভবত। ছেলেরা ধরে ছেলেটাকে মারতে যেতে অয়ন বাঁচিয়েছিল। অয়ন এককালে ভাল ছাত্র ছিল, একটু হলেও পাড়ার বাওয়ালবাজেরা তাকে মানে। ছেলেটাকে অয়ন জিজ্ঞেস করেছিল "এসেছিলি কেন?" ছেলেটার চোখটা একটু জ্বলে উঠেছিল উত্তরটা দেবার সময় "ভালবেসেছি বলেই এসেছি"। সেদিন অনেক রাত হয়ে গেছিল। ছেলেটাকে নিজের ঘরেই নিয়ে এসে বসিয়েছিল অয়ন। জয়েন্ট অফার করেছিল, ছেলেটা নেয় নি। কেন জানে না, ছেলেটাকে দেখে পুরনো দিনগুলির কথা অনেকটাই মনে পড়ে গিয়েছিল তার।

সকালে ছেলেটাকে বাসে তুলে দিয়েছিল সে। সেদিনটা নেশা না করে থাকার চেষ্টা করেছিল অনেকক্ষণ। সোনা হানা দেওয়া শুরু করল মনের ভিতর দুপুরের দিকে। শেষ মেষ আর থাকতে না পেরে বসে যেতেই হল। কিন্তু লাভ হল না কিছুই। নেশা হলেও সোনা আসে। হ্যালু-র সময়ও মাঝে মাঝে সোনা ছল ছল চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। সেই সময়টাই সব চেয়ে বেশি কষ্ট হয় তার।

একেবারে অন্য চেষ্টাও যে করে নি তা নয়। বুল্টনের ঠেকে মেয়েছেলেও পাওয়া যায়।দেখা গেল মেয়েটাকে যতই বুকের কাছে টানার চেষ্টা করে যাচ্ছে, ততবারই সোনার মুখ মনে পড়ে যাচ্ছে। মেয়েটাই শেষ মেষ গালাগাল করে তাড়িয়ে দিল তাকে। ঠেকের বাকিদের কী খিল্লি তাকে নিয়ে, "শালা হিজরা, লাগাতে পারে না, এই জন্যই বউ ছেড়েছে তোকে"... অয়ন প্রতিবাদ করে না। নির্জীব হয়ে পড়ে থাকে এক কোণায়। চোখ লাল হতে থাকে সেটা খালি চোখে দেখা যায়, বুকের ভেতরটা তো দেখার ব্যবস্থা নেই। মেয়েটার নাম টুম্পা। বুল্টনের ঠেকে গেলেই টিটকিরি মারে তাকে। খদ্দের না থাকলে গা ঘেঁষে বসে। বলে "কিরে, তোর কি সত্যি সত্যিই কিছু হয় না? একবার দেখবি নাকি চেষ্টা করে"?

অয়ন কিছু বলে না। মেয়েটা খানিকক্ষণ ঘ্যান ঘ্যান করে আবার গালাগাল দেওয়া শুরু করে দেয়। বুল্টনের ঠেকে বসে বসেই অনেক পরিচিতর বাড়ির ছেলেদের দেখে সে। পাড়ার কার ছেলে কোন দিকে যাচ্ছে সবই বুঝতে পারে সে। কিছুই বলে না। এদের বাবারা যখন তার দিকে আঙুল তুলে "এসব ছেলের জন্য পাড়ার মানসম্মান নষ্ট হচ্ছে" বলে, তখন সে মিটিমিটি হাসে। মনে মনে বলে "ওরে তোদের যে ভেতরে ভেতরে কতটা পেছন মারা যাচ্ছে তা যদি তোরা ভাল করে জানতিস"। কথাগুলি মনেই রাখে সে। প্রকাশ করে না।

এর মধ্যেই একদিন সে খবর পেয়েছিল কোন জায়গা থেকে নাকি সোনাকে দেখতে আসছে। প্রথমে বেশ খানিকক্ষণ থম মেরে বসেছিল। মনে হচ্ছিল মাথায় যেন আগুন জ্বলছে। বরপক্ষ যে গাড়ি হাকিয়েই এসেছে সেটা প্রথমে বুঝল সে। খানিকক্ষণ নিস্ফল আক্রোশে ওদের বাড়ির সামনে দিয়ে হাঁটাচলা করে গাড়ির ড্রাইভারকেই বলে দিল যা বলার। সে খুব ভাল করেই জানত ঠিকই ড্রাইভারটা বলে দেবে সে যাদের নিয়ে এসেছে তাদের। কথাগুলি বলে সেদিন ভারী নিশ্চিন্ত বোধ করেছিল সে। সোনাকে সে কারও হতে দেবে না। এত সোজা নাকি? রাগে মাথা ঝি ঝি করছিল সেদিন। বুল্টনের ঠেকে গিয়ে বসতেই টুম্পা যখন আবার ছেনালি করতে এল সটান ওর চুলের মুঠি ধরে বলেছিল সে "আর যদি কোনদিন জ্বালিয়েছিস, বুঝে নেব তোকে"...

টুম্পা তো বটেই, এমনকি বুল্টন, ওর চ্যালা পিন্টু সবাই অবাক হয়ে গেছিল সেদিন, আপাতশান্ত অয়নের এই মূর্তি দেখার পরে সবাই বেশ ভয়ই পেয়েছিল। টুম্পার টিটিকিরিটাও সেদিনের পর থেকে কমা শুরু হয়েছিল। অয়ন আজকাল দাড়ি কাটে না। জামা কোনটা পরে তার ঠিক নেই। কলেজ পাস আউটের দিন গুলিতে যেরকম সোনার অপেক্ষায় পাড়ার বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকত, এখনও মাঝে মাঝে দাঁড়ায় সে। তখন সোনা তাকাত মাঝে মাঝে। আজকাল তো তাকে দেখেই হাঁটার গতি বাড়িয়ে দেয়। অয়ন চুপচাপ দেখতে থাকে ও চলে যাচ্ছে। তার মাথা কাজ করে না। কি বলবে বুঝে উঠতে পারে না। কখনও কখনও প্রবল ইচ্ছা হয় এগিয়ে গিয়ে কথা বলতে। পারে না। কোথায় যেন গিয়ে আটকে যায়। অয়নের মনে পড়ে পুনের ছোট ফ্ল্যাটটা সাজানোর দিনগুলি। উইকেন্ডে লোকাল মার্কেট থেকে মজা করে জিনিস কেনা, তারপর ফ্ল্যাটে ফিরে সেই প্যাকেট না খুলেই আগে বেডরুমে গিয়ে দুজন দুজনকে পাগলের মত আদর করা, সোনার রান্না করতে গিয়ে খাবার পুড়িয়ে ফেলা, তা সত্ত্বেও সেই খাবারই চুপ চাপ খেয়ে যাওয়া আর তারপরে সেটা মুখে দিয়েই সোনার সেই অবাক প্রশ্ন “এটা তুমি কী করে খেলে বলতো?”, উত্তরে তার সেই হাসতে হাসতে বলা “ভালবেসে”... সবই কেমন স্বপ্নের মত মনে হয়। মাঝে মাঝে মনে হয় বটে, সত্যিই কি এসব কোন কালে ঘটেছিল? নাকি পুরোটাই হ্যালু?

চাকরি যেদিন চলে গিয়েছিল সেই দিনটা আজও হানা দেয় দুঃস্বপ্নে। প্রোগ্রামিংয়ের পরীক্ষা ছিল। একজন আরেকজনের থেকে টুকছিল। টেকনিক্যাল টিমের ফ্যাকাল্টিরা হঠাৎ এইচ আরকে ডেকে পাঠায়। পরের দিন হঠাৎ নোটিশ জারি আর আসতে হবে না। পুরো ব্যাচটাকেই বসিয়ে দিয়েছিল তাদের। অয়নের প্রথমে বিশ্বাস হয় নি। এও কী হয়? চাকরি যাওয়া কি এতই সোজা? কেউ কেউ বলেছিল রিসেশনের বাজার ছিল। এমনিই বসাত, ছুতো পেয়ে গেছিল কোম্পানি। প্রোজেক্টও নাকি একেবারেই ছিল না।

তারপরের দিন থেকে ঠিক কী হয়েছিল কিছুই আর মনে রাখতে চায় না সে। তবু এসে পড়ে দিনগুলি চোখের সামনে। কতবার যে সে আজকাল সোনার সেই চলে যাওয়ার দিনটা দেখে! ডিভোর্সের দিন হলুদ রঙের সালোয়ার পরে এসেছিল। একবারও তাকায় নি তার দিকে। ডিভোর্সটা সেও দিতে চেয়েছিল। ভেবেছিল ডিভোর্স হয়ে যাবার পরে হয়ত সোনার চলে যাওয়াটা অতটা হানা দেবে না আর তাকে। কিন্তু সে রাতেই বুঝে গেছিল আসলে যা ভেবেছিল ব্যাপারটা কোন দিক থেকেই সেরকম না। বরং উল্টোটাই। নেশা তো সে সোনা থাকাকালীনই শুরু করেছিল। কিভাবে যেন একদিন পেয়ে গিয়েছিল পুরিয়াটা। কাজ হারানোর ফ্রাস্ট্রেশনের দিনে কলেজের সেই আনন্দের দিনগুলি ফিরিয়ে আনতে গিয়ে শুরু করেছিল। কিন্তু সে নিজেই বুঝতে পারল না নেশাটা কখন যেন তাকে ঘিরে ফেলা শুরু করল। সোনার গায়ে হাতও তুলে ফেলল একদিন টাকার জন্য। গয়না বিক্রি করতে বলেছিল সে। সোনা খুব ভয় পেয়ে গেছিল। এদিকে সে তখন নেশার টানে রীতিমত কাঁপছে। মাথা কাজ করছে না। মনে হচ্ছিল যতক্ষণ না নেশাটা হবে ততক্ষণ সে খুন করে দিতে পারে “জিনিস”টার জন্য। তারপর সোনা আর থাকল না। চেনা মানুষ অচেনা হয়ে যাবার যন্ত্রণা সোনারও কম ছিল না। সেটা সে বুঝতে পারে। কষ্ট হয়। কিন্তু কি করবে।

অয়নের শুধু একটা কথা ভেবেই মাঝে মাঝে খুব কষ্ট হয়। সোনা কি একবার তাকে

বলতে পারে না ভাল হয়ে যেতে? সে চেষ্টা করত। প্রাণপণে চেষ্টা করত। কিন্তু একবার বলতে তো পারত।

টুম্পার সস্তার শরীর, ফুটপাথের কেনা লিপস্টিক নেলপালিশ তার শরীর বেয়ে ওঠানামা করে, তাকে জাগানোর চেষ্টা করে। আর সে উত্থানরহিত হয়ে পড়ে থাকে চুপচাপ। শরীর তো জাগারই কথা। তার জাগে না। আসলে সে নিজেও জানে, আজকাল সে জীবন্মৃত হয়ে গেছে। পাড়ার লোকে বলে তার বাবার মৃত্যুর কারণও নাকি সেই। কেচ্ছার গন্ধে এলাকা ম-ম করে। সে নিজেও অস্বীকার করে নি কিছুই। বাবার কাছে টাকা চেয়েছিল,বাবা বলে দিয়েছিল নিজে জোটাও নিজের নেশা, সে বলে ফেলেছিল ছোটবেলায় দেখা সেদিনের গল্পটা। জানলার ফাঁক দিয়ে দেখা মায়ের অনুপস্থিতিতে কাজের মেয়ের সাথে বাবার ঘনিষ্ঠতা। বাবার মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল তার কথাগুলি শোনার পরে। খানিকক্ষণ পরেই হার্টে ম্যাসিভ অ্যাটাক।

অয়ন জানে এই কথাগুলি সে জানে আর সোনা জানে। আর কেউ পুরোটা জানে না। এক রবিবারের ঘনিষ্ঠ দুপুরে বলে ফেলেছিল সোনাকে কথাগুলি। সোনা তাকে যে কথাটা বলেছিল সেটা এখনও স্পষ্ট মনে আছে তার "সম্পর্ক আর শরীর গুলিয়ে ফেলাটা আমাদের একটা বড় ভুল মনে হয়"। সে এখনও খুঁজে যায় কথাটার মানে। তাই? সম্পর্ক আর শরীর কতখানি আলাদা আসলে পরস্পরের থেকে? সোনাকে একদিন জিজ্ঞেস করতে হবে কথাটা। একদিন। দাড়ি কেটে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নেশামুক্ত হয়ে একদিন ঠিক দাঁড়াবে সোনার সামনে। তারপর সেদিন ঠিকই বলবে, শরীর হেরে গেছে তার সম্পর্কের কাছে। টুম্পা পারে নি সোনার স্মৃতিতে বিন্দুমাত্র থাবা বসাতে। ঘোর নেশার সময়েও।

বলবেই সে একদিন। তাকে বলতেই হবে।

১৭)
নিশান।।
সব সিনেমাতেই দীপক তিজোরির মত চরিত্র থাকে। হিরোর বন্ধু। যার আদতে হিরোর চামচা হওয়া ছাড়া কোন কাজ নেই। তা আমিও অনেক ভেবে দেখেছি দীপক তিজোরি হওয়া ছাড়া আমার কোন কাজ নেই। উপমন্যুর বিয়ে হয়ে গেলে আমি টোটাল ফাঁকা ইলেকট্রনের মত ঘুরে বেড়াব। এছাড়া আমার কোন অস্তিত্ব নেই। বাবা যেমন আমাকে উঠতে বসতে গুড ফর নাথিং বলে। কারণ রাস্তা ঘাটে ঢিল মারলে যে ইঞ্জিনিয়ারদের গায়ে লাগে আজকাল আমি সেই ইঞ্জিনিয়ার হওয়া ছাড়া আর কোন কাজ করে উঠতে পারি নি জীবনে। না, চাকরি একটা করি বটে কিন্তু সেটাও উপমন্যুর মত কোন বড় কিছুতে না। ছোট খাট কোম্পানি। তবে কপাল নিজের খারাপ বলে মোটেই মনে করি না আমি। কারণ এই মন্দার বাজারে একটা চাকরি সে যেরকমই হোক জোটানো বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।
যাক গে, দীপক তিজোরি চাকরি করল কি না করল তাতে কারও কোন যায় আসে না জানি। আমি বরং বলে নি যে এই গপ্পে আমি কেন এলাম। অকারণে হাওয়া খেতে তো আর ঘুরঘুর করছি না আমি!
ঘটনা হল মার্কেটে কিছু মেয়ে আছে। যাদের কাজ হল বেশ দামী দামী নেশা করা, আর নেশার টাকা জোটাতে না পারলে ভদ্র ঘরের কিছু মুরগী খোঁজা, যাদের পেছন মেরে নেশার টাকা জোগাড় করে নেওয়া যায়। আর যদি তাতেও না হয়, তাতে তাদের

ব্ল্যাকমেল করে টাকা উদ্ধার করা। বলতে বাঁধা নেই, আমি এমন একটা মেয়ের পাল্লায় পড়ে গেছিলাম। কিছুই করার ছিল না। ফেসবুকে আলাপ। অনেক দিন ধরেই ফেসবুকে কথা বার্তা চালা চালি হতে হতে হোয়াটস অ্যাপে বেশ মাখো মাখো দিকে চলে যাচ্ছিল ব্যাপারটা। রিলেশনে জড়ালে গার্লফ্রেন্ডের জন্মদিন ইত্যাদি তো একটা পরব আসবেই, তারও এসেছিল। তাকে একটা হীরের আংটিও দিয়েছিলাম দেখা করে। দেখা করার দিন তো কেমন মোহাব্বতে টাইপ পাতা ফাতাও উড়ছিল। আর সব সম্পর্কের মধ্যেই শরীরটা দেখা যায় কোন না কোন ভাবে চলেই আসে। আমাদেরও এসেছিল। মেয়েটা বলছিল ওর নাকি ডায়মন্ড হারবারে কোন বন্ধুর হোটেল আছে, গেলেই হয়। আমার তো শোনার পর থেকে বেশ পায়রা ওড়াউড়ি করছিল মনের ভিতর। সামনে পিছনে না ভেবে রাজি হয়ে গেলাম। ছামিয়াকে নিয়ে হোটেলের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করার মিনিট দশেকের মধ্যেই দরজায় জোরে জোরে বাড়ি। খুলে দেখি দশ বারোটা মুশকো চেহারার ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে।কি ব্যাপার জিজ্ঞেস করতেই বেদম ক্যাল। আমি নাকি মেয়েটার জীবন নষ্ট করে দিচ্ছি ইত্যাদি ফিল্মি ডায়লগ। প্রাণে বাঁচতে কি হয়েছে জানতে চাইলে বোঝা গেল কিছু না খসালে ওখান থেকে বেরনো যাবে না। আমাকে অবাক করে দিয়ে মেয়েটাও এমন ভাব করতে লাগল যে ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না। কোন মতে এটিএম থেকে টাকা তুলে একটা বাসে উঠে মা কালীর নাম জপতে জপতে কলকাতায় এলাম বাস বেহালার ওপর দিয়ে এলেও নামলাম না। এসপ্ল্যানেডে এসে বাস থেকে নামতেই দেখি পিঙ্গলদা আর তার সাথে একটা মেয়ে। আমার অবস্থা তখন কেরোসিন। জামা ছেঁড়া, মুখে কাঁটা দাগ, গোটা বাস পাবলিক পকেটমার ভেবে হ্যাটা দিয়ে গেছে, পিঙ্গলদা আমাকে দেখে অবাক। বলল “কিরে তোর এই অবস্থা কেন?”

আমি কোনমতে বলতে পারলাম “সে অনেক গল্প, পরে বলা যাবে”।

পিঙ্গলদা আর কোন কথা না বলে আমাকে বিগ বাজারে নিয়ে গিয়ে জামা কিনে দিল। সেটা পরে ধোপদুরস্ত হতে বলল “কিছু খেয়েছিস?”

মেয়েটা কোন কথা বলছিল না। আমার যদিও সেই অবস্থায় মেয়ে দেখার কোন রকম ইচ্ছা ছিল না, তবু চোখ চলেই যাচ্ছিল আর বার বার মনে হচ্ছিল মেয়েটাকে কোথায় যেন দেখেছি।

আমিনিয়ায় গিয়ে বসলাম আমরা। বিরিয়ানি অর্ডার করে পিঙ্গলদা আমার দিকে তাকিয়ে বলল “কিরে, এবার কি কিছু বলতে পারবি?”

আমি মেয়েটা থাকা সত্ত্বেও সব গড়গড় করে বলে গেলাম। পিঙ্গলদা একটুও হাসল না। পুরোটা শোনার পর বলল “একটা কাজ কর, থানায় একটা ডায়েরী করে রাখ, কি চার্জ দিবি সেটা আমি ফোন করে জেনে নিচ্ছি আমাদের অফিসের ল ইয়ারের থেকে। কোন জায়গায় সই টই করিয়ে নেয় নি তো রে?”

আমি মাথা নাড়লাম। মেয়েটা হঠাৎ করে আমাকে জিজ্ঞেস করল “যে মেয়েটা তোমাকে নিয়ে গেল তার নাম কি?”

প্রশ্নটা শুনে আমি আর পিঙ্গলদা দুজনেই অবাক হল। তবু আমি নামটা বললাম। মেয়েটা নামটা শুনে বলল “এরকম টাইপের একটা মেয়েকে আমি চিনতাম। আমাদের ক্লাসেই পড়ত। কুসঙ্গে পড়ে এসব করে বেড়াত। তোমার কাছে মেয়েটার কোন ফটো আছে?”

আমার কাছে ফটো ছিল। হোয়াটস অ্যাপেই ফটো দেওয়া নেওয়া হয়েছিল আগে। আমি মোবাইলটা বের করে ফটোটা দেখালাম। মেয়েটা দেখে পিঙ্গলের দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল “এতো আমাদের পাড়াতেই থাকে। ওর বাড়ি ঘর দেখলে কিন্তু তুমি

ভাবতেও পারবে না এ এসব করে বেরোয়। বাবা রীতিমত কলেজের প্রফেসর”।
পিঙ্গলদার চোয়াল শক্ত হল “তুমি বাড়ি চেনো এর?”
মেয়েটা বলল “হ্যাঁ, বললাম তো পাড়াতেই থাকে”।
পিঙ্গলদা বলল “চল। ওর বাড়ির লোকের সাথে দেখা করে আসি”।
মেয়েটা চমকাল। আমিও। মেয়েটা বলল “কিন্তু আমাদের পাড়ায় তুমি গেলে একটু অন্যরকম হতে পারে ব্যাপারটা তাই না?”
পিঙ্গলদা বলল “তুমি বাড়িটার অ্যাড্রেসটা দাও সেক্ষেত্রে। আমি নিশানকে নিয়ে যাব। এবং সেটা এখনই যাব। নিশান উপমন্যুর মতই আমার ভাই। ওকে এভাবে মেরেছে এটা মেনে নেব কিভাবে?”
পিঙ্গলদার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে পড়ছিলাম আরও। আমার চোখে জল এসে যাচ্ছিল। এই কিছুক্ষণ আগেও মারাত্মক ট্রমায় ছিলাম। এখন মনে হচ্ছিল সামান্য হলেও যদি কিছু করা যায় সেটা পিঙ্গলদা করবে।
মেয়েটার থেকে অ্যাড্রেস নিয়ে আমরা একটা ট্যাক্সিতে উঠলাম খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে। মেয়েটা বাড়ির বেশ খানিকটা আগে নেমে যেতে আমি পিঙ্গলদাকে প্রশ্ন করলাম “এর সাথেই কি তোমার বিয়ে হবার কথা?”
পিঙ্গলদা বলল “ছিল। এর নাম তনুশ্রী। কিছু ব্যাপার ক্লিয়ার করার ছিল। হয়ে গেল। এর সাথে আমার আর কোন রিলেশন থাকবে না”।
আমার তাই এত চেনা চেনা লাগছিল মেয়েটাকে। এর সাথেই তো পিঙ্গলদার বিয়ের কথা হয়েছিল। আমার মনে অনেক প্রশ্ন আসছিল কিন্তু সেগুলি আর পিঙ্গলদাকে জিজ্ঞেস করতে গেলাম না। এমনিতেই মরছি নিজের জ্বালায়। সকাল থেকে যেভাবে দিনটা গেল কোনদিন কল্পনাও করতে পারিনি এরকম কিছু হতে পারে। আসলে আমি মালটাই একটা গান্ডু। আমারই বোঝা উচিত ছিল আমরা যতই আধুনিক হয়ে পড়ি, একটা মেয়ে যদি যেচে শুতে চায় তাহলে মেয়েটার জিওগ্রাফি দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে হিস্ট্রিটা ভাল করে যাচাই করে দেখা দরকার। অন্তত সবাই এখনও এতটা অকারণে দিতে চাইবে না আমার মত পাবলিককে।
ট্যাক্সিটা যে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল বাড়িটা দেখে বেশ ভয়ই লাগল আমার। এত বড় বাড়ির মেয়ে এসব করে বেড়ায়? পিঙ্গলদা কিন্তু একটুও ঘাবড়াল না। আমাকে ট্যাঁকে করে নিয়ে দিব্যি কলিং বেল বাজিয়ে দিল। দরজা খুলল এক মধ্যবয়স্কা মহিলা। সায়নী মানে ঐ মেয়েটার মুখের সাথে মিল আছে। মনে হল মা। পিঙ্গলদা বলল “মাসীমা সায়নী ঘরে আছে?”
মহিলা মাথা নাড়লেন অবাক হয়ে। পিঙ্গলদার চেহারা বেশ ভাল ছেলের মত। ওর মত ছেলেরা কোন মেয়ের বাড়িতে দেখা সাক্ষাৎ করতে গেলে মেয়ের বাপ মা ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করবে না। আমি গেলে অবশ্য অন্য কথা।
ভদ্রমহিলা বললেন “না ও তো কলেজ গেছে। তোমরা কারা?”
পিঙ্গলদা বলল “সায়নীর বাবা মানে আঙ্কেল কি আছেন?”
মহিলা বললেন “হ্যাঁ। কেন বল তো?”
আমার কেমন যেন ভয়ে হাত পা সেঁধিয়ে যাচ্ছিল শরীরের ভিতর। পিঙ্গলদা কিন্তু দিব্যি স্মার্টলি কথা বলে যাচ্ছে “না আঙ্কেলের সাথে একটু দরকার ছিল। যদি একটু কথা বলা যেত তাহলে ভাল হত”।
আমাদের একটা ঘরে নিয়ে সোফায় বসালেন ভদ্রমহিলা। আমি পিঙ্গলদাকে বললাম “কি দরকার? চল পালাই? আমার খুব ভয় লাগছে”।
পিঙ্গলদা ধমক দিল আমাকে “চুপ করে থাক। একটা থাপ্পড় মারব বেশি ভাট বকলে”।

আমি থতমত খেয়ে চুপ খেয়ে গেলাম। একটু পরেই একজন বেশ শিক্ষক শিক্ষক দেখতে ভদ্রলোক ঘরে
ঢুকলেন। বললেন “তোমরা সায়নীর বন্ধু?”
পিঙ্গলদা ভদ্রলোককে দেখে উঠে দাঁড়াল দেখে আমিও উঠে দাঁড়ালাম। পিঙ্গলদা উত্তর দিল “না। তবে সায়নীর সম্পর্কে আপনাকে কিছু জানাতে এলাম। কথাগুলি না জানালেও চলত কিন্তু আমার মনে হল না জানালে একটা মেয়ের জীবন নষ্ট হয়ে যেতে পারে। খানিকটা সামাজিক কর্তব্যের খাতিরেই এলাম বলতে পারেন”।
পিঙ্গলদার এই কঠিন কঠিন কথাগুলি আমাকে বেশ চাপ দিয়ে দিল। সায়নীর মা-ও এসে দাঁড়িয়েছে দেখছি। পিঙ্গলদার কথা শুনে ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা দুজনকেই বেশ পাজলড মনে হল। ভদ্রলোক বললেন “আমি তো কিছুই বুঝলাম না। কি হয়েছে একটু খুলে বললে ভাল হয়”।
পিঙ্গলদা বলল “আপনার মেয়ে একটা বাজে চক্রে পড়ে গেছে। আমার ভাই মানে এই ছেলেটিও পড়েছিল। কিন্তু কোনভাবে পালিয়ে আসতে পেরেছে। আপনি আপনার মেয়েকে সামলান এটাই বলতে এসছি”।
ভদ্রলোক পিঙ্গলদার কথা শুনে খুব একটা রি অ্যাক্ট করলেন না। সায়নীর মাও করলেন না। একটু অবাক হলাম। তারপর বুঝতে পারলাম ওনারা জানেন ব্যাপারটা। সায়নীর মা হাল ছেড়ে দেওয়া গলায় বললেন “ও আমার মেয়ে না। ওর বাবার আগের পক্ষের মেয়ে। তবু ওকে অনেক আদরেই রাখার চেষ্টা করে গেছি। কিন্তু কিছু করা গেল না। অনেক ব্যাপারই অনেকের কাছে শুনেছি। কিন্তু বাড়িতে এসে কেউ কোনদিন কিছু বলে নি। তোমরাই প্রথম”।
ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে বসে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ। তারপর বললেন “আমি কোনদিন ভাবি নি আমাকে এই দিন দেখতে হবে। আমি কি জানতে পারি পুরো ব্যাপারটা? যদি তোমরা বলতে চাও তো বলতে পার”।
পিঙ্গলদা বলে দিল পুরো ব্যাপারটা। ভদ্রলোককে দেখে বেশ শকড মনে হল। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন “আমি অত্যন্ত লজ্জিত। আমি জানি না ঠিক কি ভাষায় ক্ষমা চাইব তোমার কাছে। তবে এটা বলতে পারি তুমি যদি কোন রকম স্টেপ নিতে চাও নিতে পার, কাউকে এতটা স্বাধীনতা দিলে যে সে এভাবে সেটার অপব্যবহার করবে সেটা আমি সত্যিই ভাবতে পারি নি। আমার তো মনে হচ্ছে সুইসাইড করি আমি”।
গলা ধরে আসছিল ভদ্রলোকের। আমি অপ্রস্তুত হলাম। পিঙ্গলদা মাঝে মাঝে এমন সব পাগলের মত কাজ করে। কি দরকার ছিল এখানে আসার। বসে বসে এখন ফ্রাস্ট্রু টাইপ কথা শুনে যেতে হচ্ছে! তবে একটা পৈশাচিক আনন্দ যে হচ্ছে না ভেতরে ভেতরে সেটাও না বলি কি করে? যে লেভেলে ক্যাল খেলাম তখন, তার কিছুটা সুদে আসলে ফেরত পাওয়া গেল এই যা।
আর ঠিক এই মোক্ষম সময়েই ঘরে ঢুকল সায়নী। আমাকে দেখে ওর মুখটা এমন হল, মনে হল কেউ ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে সাকশন করে পুরো রক্তটা টেনে নিয়েছে।

১৮)

।।সে।।

আসলে সব কিছুই একদিন না একদিন একটা পরিণতি নিয়ে আসে। আমি আশা করি না সব পরিণতিই ভালর জন্য হবে। কিন্তু কখনও কখনও সেটা হয়েও যায়। আমরা না চাইলেও, কিংবা একেবারে আশা না করলেও সেটা হয়ে যায়। আবার কোন কোন পরিণতি এতটাই খারাপ হয় যে সেটা আমরা খুব কঠিন দুঃস্বপ্নেও সেটা কল্পনা করি না।

শহর ঘোরা আমার ভেতরে এমনভাবে ঢুকে গেছিল যে মাঝে মাঝে মনে হয়েছে আমি কোন নেশার ঘোরে পড়ে গেছি। বাড়িতে এমন একটা পরিস্থিতি যেখানে আমার থাকা না থাকা সমার্থক হয়ে যাচ্ছিল। কখন যে বাড়ির বাইরেটাই বাড়ির থেকে বেশি ভাল বেসে ফেলেছিলাম সেটা নিজেই জানি না। এভাবেই একদিন আলাপ হল ছেলেটার সাথে। কখন যে ঐ বাড়ির বাইরে ঘুরতে ঘুরতে কত কিছু হয়ে গেল নিজেই জানি না। বাড়ির খেয়াল কিংবা দিদির খেয়াল আমি কোনদিনই রাখিনি।

এর মধ্যেই একদিন দক্ষিণেশ্বর গেছি, কি সব মিটিং ছিল কোন দলের, ফেরার সময় দেখি রাস্তার ভয়াবহ পরিস্থিতি, বিকেল ৫টার জায়গায় ফিরতে গিয়ে রাত আটটা হয়ে গেল। আগে বাড়ির লোকেরা রাত করলে উদ্বিগ্ন হয়ে ফোন করত, আজকাল তাও করে না। তাও দিদিকে একটা টেক্সট করে দিয়েছিলাম ফিরতে দেরী হবে বলে। রুবি তে বাস থেকে নেমে হাঁটা লাগিয়ে বাড়ির দিকে ফিরছি হঠাৎ দেখি দিদি বাড়ির সামনেটায় অস্থিরের মত পায়চারি করছে। আমি ভাবলাম আমার জন্য করছে হয়ত, দেরী করে ফেলেছি, এই কারণেই হবে, তবে একটু অবাকও যে হইনি তা না, কারণ এমনিতে আমার জন্য এভাবে কখনও চিন্তা করিনি।

দিদির কাছে গিয়ে বললাম "কিরে এরকম চিন্তা করছিস কেন? আমি তো তোকে টেক্সট করেছিলাম"।

দিদি আমার কথাটার উত্তর না দিয়ে বলল "আমাকে একটু পিজিতে নিয়ে যেতে পারবি?"

আমি ভয় পেলাম, ভাবলাম বাবা বা মার আবার কিছু হয়েছে কিনা। সেটা বলতেই দিদি বলল "না, অয়নের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। বাসের ধাক্কা খেয়েছে, বাঁচবে না মনে হয়"।

কথাগুলো বলার সময় দিদির গলা একবারও কাঁপল না। কেমন ভাবলেশহীনভাবে কথাগুলো বলে গেল... ভাল হল না খারাপ হল সেসব কিছুই না। আমার হঠাৎ করে দিদির বিয়ের দিনটার কথা মনে পড়ে গেল। এই বাড়ির বাইরেটাতেই আমরা সব অয়নদার গেট ধরব বলে দাঁড়িয়ে ছিলাম, গাড়িটা যখন ঢুকছিল সেদিন কি জ্বালানই না জ্বালিয়েছিলাম অয়নদাকে।

সব কিছু মাথার মধ্যে গিয়ে একটা বিশ্রী ভাবে পুরনো স্মৃতিগুলি টেনে উপড়ে নিয়ে আসতে লাগল। আমার মাথা আর কাজ করছিল না, ফোন বের করে পিঙ্গলকে ফোন করে বললাম "তুমি একবার আসতে পারবে? আমাদের বাড়ি? আমাদের খুব বিপদ"।

ওপাশ থেকে পিঙ্গল কিছু একটা বলল, আমার আর সেটা মাথায় ঢুকল না। বাড়ির

সামনের রকে বসে পড়লাম। ব্যাগটা কখন কাঁধ থেকে পড়ে গিয়েছিল খেয়াল নেই। সেটা রাস্তাতেই পড়ে থাকল।

।।উপমন্যু।।

পৃথিবীতে দুটো জায়গায় আমি কখনও যেতে চাই না।

১। শ্মশান

২। হাসপাতাল।

আর পিঙ্গল আমাকে সেই হাসপাতালেই নিয়ে এল। ওর সেই মেয়েটার নাকি কে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। আমি তখন নিশানের প্রেমে দাগা এবং ক্যাল কেস দুটো সামলাচ্ছি আর পিঙ্গল সোফায় শুয়ে মোবাইলে কিসব কার রেসিং খেলছিল। কিছুক্ষণ আগেই ঘরে ঢুকেছিল, নিশ্চয়ই অ্যাপো মারতে গেছিল কোথাও। একটা ফোন এল হ্যাঁ হু করল, তারপরেই আমাকে বলল "চল। এক্ষুণি রেডি হয়ে নে। নিশান তুই বস। আমরা এক্ষুনি আসছি"।

নিশানের শরীর ভাল না। ও বেঁচে গেল। আর বলি হলাম আমি। বাইকের পেছনে বসে যখন পিঙ্গলকে জিজ্ঞেস করলাম "কি হয়েছে জানা যাবে কি?"

উত্তর পেলাম "জানি না। পিজি তে যাচ্ছি"।

পিজি শুনে আমার ভিরমি খাবার জোগাড়। নিশ্চয়ই ঐ মেয়েটার কোন কেস। একটা ঘোর সন্দেহ এল মনে, আর প্রশ্নটা করেই ফেললাম "প্রেগন্যান্ট নাকি জি এফ"?

পিঙ্গল সাধারণত গালাগাল দেয় না। আমার প্রশ্নটা শুনে দিল। তারপর জানাল মেয়েটার কে পিজিতে ভর্তি। যখন পৌঁছলাম তখন রাত দশটা প্রায়। এমারজেন্সিতেও গিজগিজ করছে ভিড়। পিঙ্গল ব্যস্তভাবে এগিয়ে গেল। আমিও গেলাম ওর সাথে। মেয়েটার সাথে ওর দিদিও আছে। সে দেখলাম কেঁদেই যাচ্ছে। পিঙ্গল মেয়েটাকে বলল "কি অবস্থা? অয়নদার বাড়ির কেউ আছে?" মেয়েটা বলল "পাড়ার ক'জন এসছে। ওর মাও তো অসুস্থ। আমি তো কি করব কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। দিদি বাড়িতেও কিছু বলে আসে নি"।

মেয়েটার কথা শুনে মেয়েটার দিদি পিঙ্গলকে বলল "তুমি প্লিজ আমার বোনকে একটু বাড়ি পৌঁছে দাও, আমাকে এখানেই থাকতে হবে"।

মেয়েটা সাথে সাথে প্রতিবাদ করে বলল "তুই চুপ কর তো দিদি। তোকে ফেলে রেখে কোথাও যাচ্ছি না আমি"।

খানিকক্ষণ পরে ডাক্তারদের সাথে কথা বলে যা জানা গেল মাথায় হেমারেজ হয়েছে। ভদ্রলোক কোমায় চলে গেছেন। যে কোন সময় যে কোন কিছু ঘটতে পারে"।

আমার একটা অদ্ভুত অস্বস্তি তৈরি হচ্ছিল হাসপাতালে আসার নাম শুনেই। এখন ডাক্তারবাবুর মুখে পেশেন্টের অবস্থা শুনে গা-টা কেমন যেন গুলিয়ে গেল। আমি পিঙ্গলকে বললাম “আমি একটু বাইরে থেকে হেঁটে আসি। আমার কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছে একটা”।

পিঙ্গল মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

আমি বাইরেটায় এসে দাঁড়ালাম। কত লোক যে অসুস্থ হয় প্রতিদিন, আর তাদের বাড়ির লোক কিভাবে দিনের পর দিন এখানে এসে বসে থাকে তা বোধ হয় এখানে না এলে জানতে পারতামই না। আমার বরাবরই হাসপাতাল ডাক্তারে বেজায় ভয়। ছোটবেলায় পায়ে একটা ফোড়া হয়েছিল। সেটা কোন সময়ে খুঁটে দিয়েছিলাম কে জানে, মালটা বাড়তে বাড়তে বেশ বড় হয়ে গেছিল। বাবা মা লোকাল নার্সিং হোমে নিয়ে গেছিল। তাতেই মোটামুটি এলাকা মাথায় তুলে দিয়েছিলাম। আর এই এখানে তো এক সে বড় কর এক সব কেস দেখতে পারছি। সব থেকে খারাপ লাগছে কতগুলো ছোট ছোট বাচ্চাদের দেখে। চোখে দেখা যায় না এদের এত কষ্ট।

সম্প্রীতি ফোন করছে,ফোনটা ধরতেই ওর উত্তেজিত গলা ভেসে এল “আরে তোমায় সেই মাসতুতো দাদার কথা বলেছিলাম না, ডিভোর্সের পরে নেশারু হয়ে গেছিল, সে আজকে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে”।

আমার মনে পড়ে গেল সম্প্রীতি বলছিল বটে সেদিন পিঙ্গলের এই গার্লফ্রেন্ডের কাউকে চেনে, কোন একটা দূর সম্পর্কের রিলেটিভ না কী হবে, আমি বললাম “আরে আমি তো এখানেই আছি। পিজিতে। পিঙ্গলদা নিয়ে এল তো”।

সম্প্রীতি বলল “দেখেছ? কি কোইনসিডেন্স না? দাঁড়াও, মা বাবা যাচ্ছে, আমিও বেরচ্ছি ওদের সাথে”।

আমি খুশিই হলাম। রথ দেখা আর কলা বেচা দুটোই হবে একসাথে। ফোনটা রেখে আবার হাসপাতাল মুখো হলাম আর কার মুখ দেখে আজ ঘুম থেকে উঠেছি! দেবোপমা। একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। আমি হিসেব করলাম সম্প্রীতির এখানে আসতে আধঘণ্টা কম করে লাগবেই। দেবোপমার কী কেস একবার জেনে নেওয়া যেতেই পারে। এগিয়ে গেলাম। সবুজ সালোয়ার পরে আছে। মাথায় সিঁদুর!

১৯)

।।উপমন্যু।।

যেদিন প্রথম দেখা করতে গেছিলাম সেদিন দেবোপমার অপ্রত্যাশিত রূপ দেখে চমকে উঠেছিলাম। ভেবেছিলাম আমি মনে হয় স্বপ্ন দেখছি। আর আজকে মনে হল মেয়েটা যেন আরও সুন্দর হয়ে গেছে। সিঁদুর সালোয়ারের প্যাকেজের এফেক্ট কি না জানি না কিন্তু এত গ্যাঞ্জামের মধ্যেও দেবোপমাকে দেখে আমার কেন জানি না হার্ট বিট মিস করে গেল। আসলে আমি তো বরাবরই চরিত্রহীন... অন্তত সারাজীবন ধরে যা করে

বেড়িয়েছি তা কোনটাই আমাকে গুড ক্যারেক্টারের সার্টিফিকেট দেবে না। একটা কমিটেড ছেলে হয়েও তাই দেবোপমা আজকেও আমাকে চুম্বকের মত টানতে লাগল।

মেয়েটা বোধহয় আমাকে দেখতে পায় নি, একা একা কেঁদে যাচ্ছে। আমি চুপচাপ ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সামনা সামনি আমাকে দেখে ও খানিকটা বিহ্বল চোখে আমার দিকে দেখল। তারপর বলল “তুমি এখানে?”

আমি বললাম “ওই এক রিলেটিভ ভর্তি আছেন। তোমার কী হয়েছে? এভাবে দাঁড়িয়ে কাঁদছ যে?”

দেবোপমা যা বলল তাতে আমার মোটামুটি হালত খারাপ হয়ে গেল। তিন মাস হল বিয়ে হয়েছে ওর। মা দু বছর আগে মারা গেছেন। বাবা এসছিল ওদের বাড়িতে। সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে ফিরে হাসব্যান্ড বাইকে করে দিয়ে আসতে যাচ্ছিল ওনাকে। রুটের দুটো বাসের রেষারেষির মাঝখানে পড়ে যায়। বাবা স্পট ডেড। হাসব্যান্ড লাইফ সাপোর্টে আছে। ওর বরের বাড়ি উত্তরবঙ্গে। আপাতত এখানে কেউ নেই। কোন একটা ফোন পেয়ে এখানে এসে দেখছে এই অবস্থা।

আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না কী করার আছে। পিঙ্গল ভিতরে ছিল। ও থাকলে হয়ত আমার খানিকটা উপকার হত। আমি কি দেবোপমাকে সান্ত্বনা দেব? সময়ের হিসাব বলছে আমার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওর সামনে থেকে কেটে পড়া দরকার, সম্প্রীতি যে কোন সময়ে এখানে এসে পড়বে। এসে যদি দেখে কোন এক নাম না জানা সুন্দরীকে মাথায় হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছি তাহলে নিশ্চয় খুব একটা ভাল জিনিস হবে না। কিন্তু আমি তো সরে যেতেও পারছিলাম না। এই মেয়েটার সাথে আমি একসময় প্রেম করেছি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফোন করে কাটিয়েছি, এই মেয়েটা এককালে আমার জন্য আত্মহত্যা করতে গেছিল, আমি ওকে একা রেখে কী করে এখান থেকে চলে যাই? এই বৃত্তটা যে একদিন এভাবে আমার সামনে এসে মিলতে চাইবে সেটা কোনদিন স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি।

দুজন অপরিচিত ভদ্রলোক আমাদের দিকেই দৌড়তে দৌড়তে এল। দেবোপমাকে দেখে বলল “বৌদি ডাক্তারবাবু বলছেন অব্জারভেশনে রাখতে হবে। কী করবেন? অন্য কোথাও নিয়ে যাবেন?”

দেবোপমা বিহ্বল চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। বুঝতেই পারছিলাম সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। আমি অনুমানে যা বুঝলাম ওর বরের কলিগ বা পাড়ার লোক টোক কেউ হবে। আমিই ওদের জিজ্ঞেস করলাম “কেন এখানে কি ঠিক বুঝছেন না?”

ভদ্রলোক একবার দেবোপমার দিকে আর একবার আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে বললেন “একটু এদিকে আসুন”।

আমি বুঝলাম দেবোপমার সামনে নিশ্চয়ই বলার মত কিছু না, ক্রিটিক্যাল অবস্থা যখন। একটু সরে এলাম। ভদ্রলোক ফিসফিস করে বললেন “আপনি কি বউদির দাদা?”

আমি কিছু না ভেবেই বললাম "হ্যাঁ, কী বলছিলেন বলুন প্লিজ"।

ভদ্রলোক ওই নীচু গলাতেই বললেন "ডাক্তারবাবু সরাসরিই বললেন কিচ্ছু করার নেই। যে কোন সময়..."

আমি আগেই বুঝেছিলাম উনি এরকম কিছুই বলবেন। মাথাটা কেমন ভার ভার লাগছিল। একটু দূরেই দেবোপমা দাঁড়িয়ে আছে, মা নেই, বাবা খানিকক্ষণ আগে মারা গেছেন, বর মারা যাবে কিছুক্ষণ পরে, আমি এখন কী করব? এখান থেকে সরে পড়ব?

সম্প্রীতিরা এসে পড়েছে। আমাকে দেখে এদিকেই এগিয়ে এল। আমাকে দেখে জিজ্ঞাসু চোখে সম্প্রীতি বলল "কী খবর? তুমি এখানে? অয়নদা কোথায়?"

আমি বললাম "অয়নদা আই সি ইউতে আছে। পিঙ্গলদারা ভিতরে আছে। তোমরা যাও"।

সম্প্রীতি একবার আমার দিকে আরেকবার দেবোপমার দিকে তাকিয়ে কিছু একটা আন্দাজ করতে চেষ্টা করল। তারপর বলল "ঠিক আছে। আমরা তাহলে ভিতরে যাচ্ছি। তুমি আস"।

আমি মাথা নাড়লাম।

ভদ্রলোক এতক্ষণ দেখছিলেন আমাদের। সম্প্রীতি চলে যেতে বললেন "আরো কোন পেশেন্ট ভর্তি আছে?"

আমি হ্যাঁ বললাম। ভদ্রলোক বিষণ্ণ মুখে বললেন "আই সি ইউর ভয়াবহ অবস্থা। ইন্সট্রুমেন্টস আর ভেন্টিলেশন কাজ করছে না বলছে"।

আমি চমকে বললাম "সে কী! তাহলে তো এখানে রাখাই যাবে না!"

ভদ্রলোক বললেন "ডাক্তারবাবু বললেন হাত পা তো ভেঙ্গেছেই, রিবস ভেঙে কিডনি ড্যামেজ হয়ে গেছে। ব্রেনে মারাত্মক চোট লেগেছে। এই অবস্থায় আর টানা হ্যাচড়া করবেন?"

দেবোপমা আর ধৈর্য রাখতে পারল না। আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলল "কী করা যায় বল প্লিজ... আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না"।

আমি অসহায়ের মত ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। কী বলব কিছুই বুঝতে পারলাম না।

২০)

।।সে।।

“অয়নের উচ্চমাধ্যমিকে স্টার ছিল। জয়েন্টের প্রথম দিককার ছাত্র”। সম্প্রীতির বাবা থেমে থেমে কথাগুলি বললেন। পিঙ্গল কিছু বলল না। আমি জানতাম কথাগুলো। দিদি পাথর হয়ে বসে আছে।

আমরা তো আসলে মুক্তিই চেয়ে এসেছিলাম। অয়নদার থেকে মুক্তি। দিদির একটা নতুন জীবন। পুরনো সমস্ত কিছু অভিশাপের হাত থেকে।

আজকে হয়ত আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা পেয়ে যাব। কিন্তু তাতে একফোঁটাও আনন্দ পাচ্ছি না কেন? কেন বার বার মনে পড়ছে সেই দিনগুলির কথা যেদিন দিদির জন্য অয়নদা দাঁড়িয়ে থাকত বাস স্ট্যান্ডে। পাড়ার সেই ঝকঝকে ছেলেটা। কখন যেন সব কিছু শেষ হয়ে গেল। একটা স্বপ্ন চোখের সামনে এভাবে ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে দেখলাম, একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। পুরোটা দেখতে হল আমাদের। মনে আছে বিয়ের আগে আগে দিদির সেই কথাগুলি... “জানিস ছেলেটা একদম পাগলা। শাড়ি কিনতে গিয়ে বলছে সবাই এখানে থাক, চল আমরা চুপচাপ পালিয়ে যাই। একা একা ঘুরে আসি। ভাব জাস্ট”... দিদির সেই হাসি... সেই চোখ এখন এই জন্মের বলে আর মনে হয় না।

হাসপাতালের অসংখ্য রুগী, লোকের কষ্ট, রোগ সব ভুলে শুধু দিদির সেই কথাগুলিই বারবার মনে পড়ছে কেন আজকে জানি না।

“আমিই মনে হয় ওর জীবনের অলক্ষী ছিলাম রে”। দিদি বলল ধীরে ধীরে কথাটা। দিদির চোখে একফোঁটা জল নেই।

আমি ওর হাতটা ধরলাম। হাতে কোন সাড় নেই। অয়নদার থেকে যেদিন মার খেয়ে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে দিদি আমাদের বাড়ি চলে এসছিল সেদিনও এরকমই ছিল। আসলে দিদিও সেদিনই মরে গেছিল। অয়নদাও। আমি তো অনুভব করতে পেরেছিলাম প্রতিদিন। আজকে তো শুধু শেষকৃত্য চলছে সব কিছুর।

সম্প্রীতির সাথে আমার আগে দেখা হয়েছিল দক্ষিণেশ্বরে। ওকে একটু বিহ্বল মনে হচ্ছে। না বসে আমাদের সামনে হাঁটাহাঁটি করছে আর বাইরের দিকে তাকাচ্ছে। আমি বুঝলাম ও উপমন্যুকে খুঁজছে। আমি দিদির পাশ থেকে উঠে সম্প্রীতির কাছে গিয়ে বললাম “কী হল? তুমি কি উপমন্যুকে খুঁজছ?”

সম্প্রীতি প্রশ্নটা শুনে হকচকিয়ে গেল “না মানে ও হঠাৎ বাইরে ব্যস্ত হয়ে পড়ল কেন বুঝলাম না ঠিক”।

আমার কেন জানি না মনে হল সম্প্রীতি উপমন্যুকে সন্দেহ করছে। ওকে অভয় দেবার ভঙ্গিতে বললাম “তুমি এখানে বস। হয়ত কেউ বিপদে পড়েছে, ও ওখানে আছে। হাসপাতালে তো কত পরিচিত মানুষের সাথেই দেখা হয়ে যায় তাই না?”

সম্প্রীতি আমার কথা শুনে আশ্বস্ত হল নাকি জানি না তবে বসল।

আমি খুব ভাল করে জানি আজকের পর থেকে দিদি আরও পাথর হয়ে যাবে। ছেলে পক্ষ দেখতে এলে আগের মতই চুপচাপ যন্ত্রের মত সেজে চুপচাপ বসে পড়বে। মিষ্টি চা সবই বাধ্য মেয়ের মত নিয়ে যাবে। বাইরের লোক যারা দিদিকে চেনে না, তারা কিছুই বুঝতে পারবে না, একের পর এক প্রশ্ন করে যায়, বাধ্য মেয়ের মত দিদি উত্তর দিয়ে যাবে।

আর আমি বাবা মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে যাব। মা বিশ্বাস করবে দিদির বিয়ে ভালোয় ভালোয় হয়ে গেলে সব কিছু আবার আগের মত হয়ে যাবে, আমি জানি কিছুই আর আগের মত থাকবে না। দিদি সারাটা জীবন অভিনয় করে যাবে পাথরের মত। আর আমাকেও অভিনয় করে যেতে হবে পিঙ্গলকে ভাল না বাসার। যতটা সম্ভব ওর থেকে দূরে দূরে থাকার। আমাদের মত সমস্যাসঙ্কুল পরিবারে ওর বিয়ে হওয়া মানে ওর জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে। আমি খুব ভাল করে জানি আসলে আমার দিদির কোনদিনই বিয়ে হবে না। ডিভোর্সী, রোবটের মত, মধ্যবিত্ত একটা পরিবারের মেয়েকে কে বিয়ে করবে?

পিঙ্গলের দিকে তাকালাম। শুধু আজকের দিনটাই ওর বয়স অনেকটা বাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। বাকি সারাজীবন যদি এরকম হয়? ভাবতে পারছি না।

ফোন নম্বর পাল্টে ফেলব, প্রয়োজনে জঘন্য ব্যবহার করব কিন্তু কিছুতেই ওকে এই অভিশপ্ত জীবনে টেনে আনব না। ও আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। অভয় দেওয়ার চেষ্টা। আমিও হাসলাম। মনে মনে শুধু বললাম “বিদায় পিঙ্গল। ভাল থেকো তুমি। ভুলে যেও আমাকে”।

২১)

-সেদিন মেয়েটা কে ছিল?

-কোথায়?

-জেনেও না জানার ভাব করছ কেন? হাসপাতালে

-ওহ। আমার বন্ধু। বাইক অ্যাক্সিডেন্টে ওর বাবা আর বর দুজনেই চলে গেলেন। অয়নদা যেদিন মারা গেলেন, একই দিনে।

-শুধু বন্ধু?

-ছিল একসময় কিছু একটা। কিন্তু বেশিদিন এগোয় নি।

-আগে বল নি কেন?

-বলতাম তো। বিয়ের পরে

-কোনদিন বলতে না যদি আমি সেদিন না দেখতাম আর জিজ্ঞেস না করতাম

-তাই যদি হত তাহলে তো তোমাকে লুকাবার চেষ্টা করতাম আমি তাই না?

-সে আমি কী জানি! যাই হোক, মেয়েটার কী হল তারপরে?

-কিছুই হয় নি। ওর বরের কলিগরা ওকে ওদের অফিসে চাকরির একটা ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছে।

-ঈশ। হয়ে গেলে ভাল তাই না?

-হ্যাঁ।

-তুমিও দেখ না যদি কিছু করতে পার

-আমি কী করব! আমার নিজেরই নতুন চাকরি।

-না না। তাও দেখ। এই সুযোগে পুরনো ব্যথার সাথে দেখাও হয়ে যাবে মাঝে মাঝে।

-ওহ... আসলে এই কথাটাই শোনাবার ছিল

-শোনাব তো! শোনাব না? সিসিটিভি রাখতে পারলে বেশি খুশি হতাম। কোথায় কী করে বেড়াচ্ছ!

-কিছুই করছি না।

-সে আর আমি দেখতে যাচ্ছি নাকি!

-আচ্ছা। আমি আর ওর খোঁজ টোজ রাখব না

-সেকী! তাহলে কী করে হবে! একটা অনাথ মেয়ে কলকাতায় একা একা থাকবে আর খবর রাখবে না সেটা হয় নাকি?

-বোঝ। তুমিই ঠিক কর তাহলে আমি কী করব!

-ঠিক করার কী আছে! দূর থেকে খোঁজ রাখবে! কোন হেল্প চাইলে দেখবে। কিন্তু বেশি কাছে যাবার চেষ্টা করলেই ঠ্যাং ভেঙে দেব বলে রাখলাম!

-আচ্ছা মা জননী। আপনার আদেশ শিরোধার্য।

- মা জননী? বউকে মা বানিয়ে দিলে?

- আর কী বানাব বল। তুমি একপিসই আমার ভিত নাড়িয়ে দিলে।

-থাক আর কিছু বলব না।

-আচ্ছা বল বল।

-বলছি পিঙ্গল শেষ পর্যন্ত মেয়েটার সাথে কিছু করতে পারল?

-জানি না। বিয়ের কথা উঠলে এমনভাবে তাকায় আর কেউ কিছু বলার সাহস করে উঠতে পারে না।

-এইভাবেই চলবে তাহলে?

-জানি না। সব প্রশ্নের উত্তর কি আমি জানি?

-জান তো। ছোটবেলায় আমার বাবা ছিল আমার গুগল। এখন তুমি। সব প্রশ্নের উত্তর তুমি জান।

-আমার যে আরও অনেক কথা বলার আছে সম্প্রীতি। আরও অনেক অতীত।

-থাক বাবা। কোন দরকার নেই আমার তোমার অতীত জেনে। অত অতীত ধুয়ে কি জল খাব?

- আমি সেদিনই ঠিক করেছিলাম, আমি আর কোন কিছু লুকোব না তোমার কাছে। আমার যা যা বলার আছে সব বলব তোমাকে। যদি কোনদিন তোমার অজান্তে আমার সব অতীত সামনে চলে আসে? আমি তো মিথ্যেবাদী হয়ে যাব তাহলে!

-মিথ্যেবাদী হয়ে যাবে? কত মিথ্যে বলেছ তুমি আমায়?

-শুনবে সব?

-নাহ। বলতে হবে না আজ।

-কিন্তু আমি তো বলব।

-বোল কোন একদিন। কিন্তু আজ আমি তোমার থেকে অতীত শুনতে চাই না। আমাকে ভবিষ্যতের গল্প শোনাও।

-ভবিষ্যতের গল্প? তাহলে বল ছেলে হলে কী নাম রাখবে আর মেয়ে হলেই বা কী নাম রাখবে?

-ধুস!!! যাও তো!!!

২২।

।।সে।।

কোন কোন সন্ধ্যে এমনভাবে আসে যে তার জন্য কেউ প্রস্তুত থাকে না। রাস্তা চেঞ্জ করে দিনের পর দিন পিঙ্গলের থেকে দূরে যাবার চেষ্টা করে গেছি রোজ। বাড়ি ফিরে দিদিকে দেখি রোবটের মত ঘরের কাজ করে যাচ্ছে। কোন কোনদিন হঠাৎ করেই দিদির কোন সম্বন্ধ চলে আসে। দিদি চুপচাপ বসে থাকে। পাত্রপক্ষ দু চারটে প্রশ্ন করেই বুঝে যায় আসলে মেয়ের বিয়ের কোন ইচ্ছে নেই।

ওরা চলে গেলেই অশান্তি নেমে আসে বাড়িতে। বাবা মা যা নয় তাই বলে চলে দিদিকে। দিদি কোন উত্তর দেয় না। ভাবলেশহীন মুখ করে বসে থাকে।

আমি সে সময়টা ঘর ছেড়ে বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকি। এখানেই অয়নদা বসে থাকত। পাড়ার সবাই জেনে গেছে আমাদের বাড়ির অশান্তির কথা। কেউ এখন আর অবাক হয় না।

সেদিন পাত্রপক্ষ আসতেই আমি বেরিয়ে গেলাম। ড্রয়িং রুমের বড় ঘড়িতে তখন সন্ধ্যে সাতটা।

একটু একটু বৃষ্টি নেমেছে তখন। দৌড়ে বাসস্ট্যান্ডের কাছে পৌঁছে একটা শকমত খেলাম। পিঙ্গল।

আমি প্রথমে ভাবলাম ফিরে যাই। কিন্তু পা ধীরে ধীরে ওর কাছেই নিয়ে গেল আমাকে। পিঙ্গল আমাকে দেখে হাসল, আমিও হাসলাম।

তারপর বলল “তাহলে? এটাই তোমার ঠেক?”

আমি আবার হাসলাম।

পিঙ্গল বলল “পালাতে ভাল লাগে?”

আমি বললাম “শেষ পর্যন্ত তো পালাতেই হবে”।

পিঙ্গল কিছু বলল না। বাস স্ট্যান্ডে দুজনে পাশাপাশি বসে রইলাম।

পাড়ার যারা এতদিন আমাকে দেখে অবাক হওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল, আমার সাথে একটা অচেনা ছেলেকে বসে থাকতে দেখে তাদের অবাক ভাব আবার ফিরে আসতে লাগল। আমার অনেকদিন পরে খুব মজা লাগছিল। কিন্তু আমি কিছু বললাম না।

মাঝে মাঝে চুপচাপ বসে থাকতেও যে এত ভাল লাগতে পারে কোনদিন বুঝিনি আগে...

(শেষ)